Nishithini by Humayun Ahmed

suman_ahm@yahoo.com

হুমায়ূন আহমেদ

নিশীথিনী

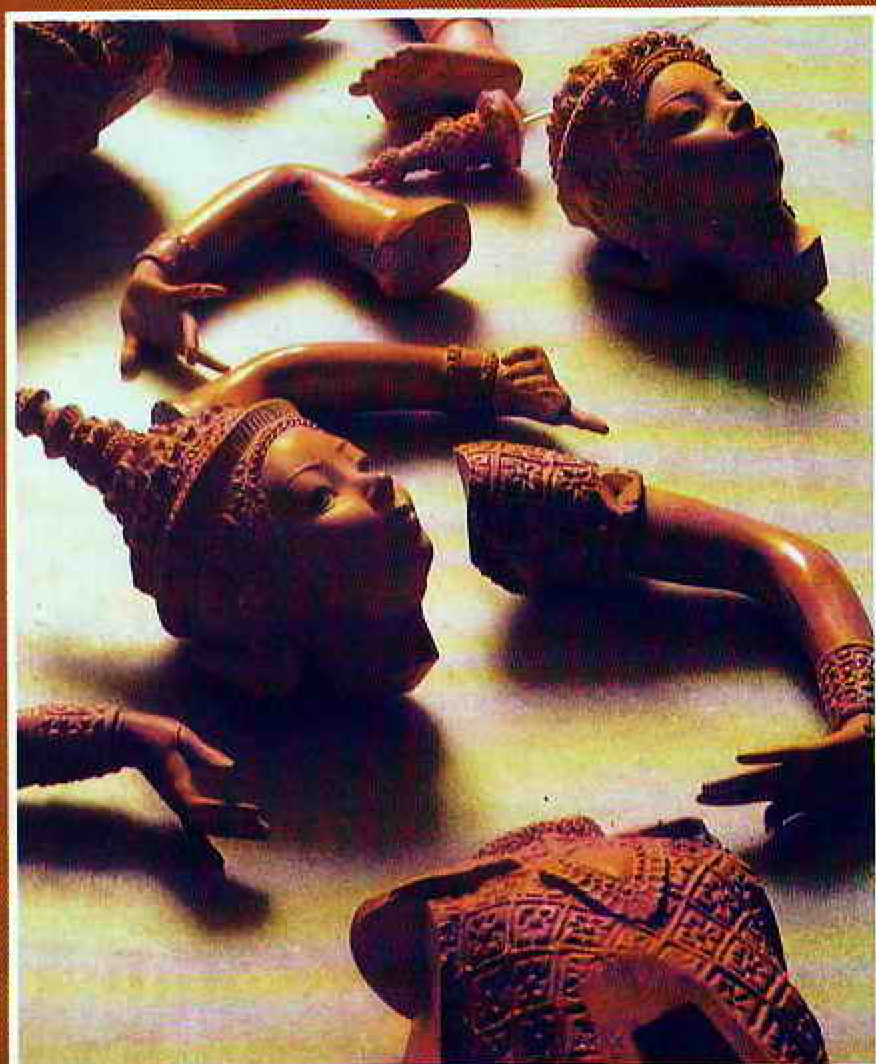

প্রকাশকের প্রতিক্রিয়া

দেবী'র দ্বিতীয় পর্ব এই নিশীথিনী। আর দেবীর মতোই এটিও একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এবং আগে কোথাও প্রকাশিত হয় নি। দেবী প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকদের আগ্রহ ও অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হল মিসির আলির আরেকটি রহস্য-উন্মোচন পর্ব।

১

মিসির আলির ধারণা ছিল, তিনি সহজে বিরক্ত হন না। এই ধারণাটা আজ ভেঙে যেতে শুরু করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তিনি অসম্ভব বিরক্ত। যে রিকশায় তিনি উঠেছেন, তার সীটটা ঢালু। বসে থাকা কষ্টের ব্যাপার। তার চেয়েও বড় কথা, দু' মিনিট পরপর রিকশার চেইন পড়ে যাচ্ছে।

এখন বাজছে দশটা তেইশ। সাড়ে দশটায় থার্ড ইয়ার অনার্সের সঙ্গে তাঁর একটা টিউটরিআল আছে। এটা কোনো ক্রমেই ধরা যাবে না। যে-হারে রিকশা এগুচ্ছে, তাতে ইউনিভার্সিটিতে পৌছতে তাঁর আরো পনের মিনিট লাগবে। এ কালের ছাত্ররা এতক্ষণ তাদের টিচারদের জন্যে অপেক্ষা করে না।

মিসির আলি তাঁর বিরক্তি ঢাকবার জন্যে একটা সিগারেট ধরালেন। ঠিক তখন পঞ্চম বারের মতো রিকশার চেইন পড়ে গেল। রিকশাওয়ালার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে চেইন পড়ার ব্যাপারটায় সে আনন্দিত। গদাইলশকরী চালে সে নামল এবং সামনের চাকাটা তুলে ঝাঁকাঝাঁকি করতে লাগল।

চেইন পড়ে গেলে কেউ চাকা তুলে ঝাঁকাঝাঁকি করে বলে তাঁর জানা ছিল না। রুক্ষ গলায় বললেন, 'এ রকম করছ কেন?'

রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। গরম চোখে তাকাল এবং মিসির আলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একটা বিড়ি ধরাল। মিসির আলি রাগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কুড়ি থেকে এক পর্যন্ত উল্টো দিকে গুনলেন। জীবনানন্দ দাশের 'মনে হয় একদিন' কবিতার প্রথম চার লাইন মৃদু স্বরে আওড়ালেন। মিসির আলির ধারণা, কিছু কিছু কবিতা মানুষের অস্থিরতা কমিয়ে দেয়। 'মনে হয় একদিন' এমন একটি কবিতা।

কিন্তু আজ তাঁর রাগ কমছে না। রিকশাওয়ালা কঠিন মুখ করে নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি টানছে। মিসির আলির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

মিসির আলি নিজেকে সামলাবার জন্যেই ভাবতে লাগলেন--তিনি নিজে যদি সিগারেট ধরাতে পারেন, তাহলে এই লোকটি পারবে না কেন? জুন মাসের প্রচন্ড

suman_ahm@yahoo.com

গরমে বেচারা ক্লান্ত ও বিরক্ত। এক জন ক্লান্ত ও বিরক্ত মানুষের নিশ্চয়ই বিশ্রাম করার অধিকার আছে। তিনি হালকা গলায় বললেন, 'নাম কি তোমার?'

'সামসু।'

'বাড়ি কোথায় তোমার সামসু?'

'বাড়ি–ঘর নাই।'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। সামসু রিকশা চালাও। ক্লাস মিস হবে।'

সামসু কোনো পাত্তাই দিল না। রাস্তার পাশে পেচ্ছাব করতে বসে গেল। তার বসার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছে সে সহজে উঠবে না, বসেই থাকবে। এই লোকটি কি কোনো–একটি অজ্ঞাত কারণে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছে?

মিসির আলি রিকশা থেকে নেমে পড়লেন। পাঁচ টাকা ভাড়া ঠিক করা ছিল, তিনি ছ'টাকা দিলেন। সহজ স্বরে বললেন, 'নাও, ভাড়া নাও। আমি হেঁটে চলে যাব।'

সাধারণত রিকশাওয়ালাদের সবচেয়ে ময়লা ন্যাতন্যাতে নোটগুলো দেয়া হয়। মিসির আলি তাকে দিয়েছেন কচকচে নতুন নোট। এটা তিনি করলেন এই আশায়, যাতে সামসু নামের এই উদ্ধত যুবকটি তাঁর আচরণের জন্যে লজ্জিত বোধ করে।

এ রকম কাণ্ডকারখানা মিসির আলি সাহেব করে থাকেন। একবার বাসে তাঁর পাশে সুখী–সুখী চেহারার এক বুড়ো বসল। দু' জনের সীট। কিন্তু বুড়ো অকারণে পা ফাঁক করে তাকে চাপ দিতে লাগল। বিশ্রী কাণ্ড। মিসির আলি খানিকক্ষণ চাপ সহ্য করলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, 'আপনার বোধ হয় অল্প জায়গায় বসার অভ্যেস নেই, আপনি বরং একাই এখানে আরাম করে বসুন।'

মিসির আলি ভেবেছিলেন, লোকটি এতে লজ্জিত ও বিব্রত হবে। সে–রকম কিছু হল না। লোকটি নির্বিকার ভঙ্গিতে দু' জনের জায়গা দখল করে পা দোলাতে লাগল। এরা অসুখী মানুষ। নিজেদের ব্যক্তিগত যন্ত্রণা এরা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ঢাকা শহরে অসুখী মানুষের সংখ্যা এত দ্রুত বাড়ছে কেন ভাবতে ভাবতে মিসির আলি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। মাথার ওপর জুন মাসের গনগনে আকাশ। রাস্তাঘাট তেতে উঠেছে। বাতাসের লেশমাত্রও নেই। এ বছর অসম্ভব গরম পড়েছে। এই অসহ্য গরমে রিকশাওয়ালারা মানুষ টানে কিভাবে কে জানে! মিসির আলি সামসু নামের উদ্ধত যুবকটির জন্যে এক ধরনের মায়া অনুভব করলেন।

ক্লাস ফাঁকা। আসমানী রঙের জামদানি শাড়ি পরা একটি মেয়ে শুধু সেকেন্ড বেঞ্চে বসে আছে। মেয়েটির মাথায় ঘোমটা। এটা একটা নতুন ব্যাপার। ইউনিভার্সিটির মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দেয় শুধু আজানের সময়।

মিসির আলি ঢুকতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। তিনি অপ্রস্তুত স্বরে বললেন, 'দেরি করে ফেললাম। সবাই চলে গেছে নাকি?'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি বসে আছ কেন? তুমি কেন ওদের সঙ্গে গেলে না?'

মেয়েটি মৃদু স্বরে বলল, 'স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'হ্যাঁ চিনতে পারছি। তোমার নাম নীলু।'

'জ্বি।'

'তুমি তো এই ক্লাসের নও।'

'জ্বি না।'

'তাহলে?'

'আমি স্যার আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে আছি। আমি রুটিনে দেখেছি আজ আপনার এখানে ক্লাস।'

মিসির আলি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তোমার কি বিয়ে হয়েছে? মাথায় ঘোমটা, তাই বললাম। নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েরা প্রথম দিকে ঘোমটা পরে।'

'আমার বিয়ে হয় নি।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনার সঙ্গে আমার খুব একটা জরুরী কথা আছে স্যার।'

'বল।'

'আমি স্যার অনেকটা সময় নিয়ে কথাটা আপনাকে বলতে চাই। আমি কি স্যার আপনার বাসায় যেতে পারি?'

'বাসায় আমার কিছু ঝামেলা আছে।'

'তাহলে স্যার, আপনি কি আমাদের বাসায় একটু আসবেন? আমার খুব দরকার।'

'ঠিক আছে, যাব।'

'আমাদের বাসার ঠিকানা কি আপনার মনে আছে? একবার গিয়েছিলেন আমাদের বাসায়। আমাদের বাসার দোতলায় আপনার এক জন পরিচিত মহিলা থাকতেন। রানু নাম।'

'আমার মনে আছে।'

'স্যার, আপনি কি আজই আসবেন? আমার খুব দরকার।'

মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে। এই মেয়ের নাম নীলু, কিন্তু কোনো–এক বিচিত্র কারণে তাকে অবিকল রানুর মতো দেখাচ্ছে।

'স্যার, আপনি কি আজই যাবেন?'

'ঠিক আছে রানু।'

'আমার নাম কিন্তু স্যার নীলু।'

মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটা হাসছে। যেন তাকে রানু বলায় সে খুশি। এটাই যেন আশা করছিল।

'আমাদের বাসার ঠিকানা কি লিখে দেব?'

'লিখে দিতে হবে না। আমার মনে আছে।'

'আসবেন কিন্তু স্যার।'

'আসব। আমি আসব।'

'যাই স্যার, স্লামালিকুম।'

www.Murchona.com

নীলু উঠে দাঁড়াল। এত সুন্দর মেয়েটি! শ্যামলা গায়ের রঙ। চোখে মুখে তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু তবু এমন মায়া জাগিয়ে তুলছে কেন? মিসির আলি লজ্জিত বোধ করলেন। তাঁর বয়স একচল্লিশ। এই বয়সের এক জন মানুষের মনে এ জাতীয় তরল ভাব থাকা উচিত নয়। তা ছাড়া এই মেয়েটি তাঁর ছাত্রী।

মিসির আলি শূন্য ক্লাসে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। একসঙ্গে বেশ কয়েকটা জিনিস নিয়ে তিনি ভাবছেন। মেয়েটির মাথায় ঘোমটা কেন? এই মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরেই ক্লাসে আসছে না কেন? মেয়েটি চলে যাবার সময়ও একটা অস্বাভাবিক আচরণ করেছে। সোজাসুজি হেঁটে গেছে, একবারও পেছনে ফিরে তাকায় নি। মেয়েরা সাধারণত পেছন ফিরে তাকায়।

সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপারটি হচ্ছে, একটি মৃতা মেয়ের ছাপ আছে নীলুর মধ্যে। যেভাবেই হোক আছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না।

তিনি সিগারেট ধরালেন।

প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না--কথাটা কি সত্যি? তাঁর মনে হল, সত্যি নয়। প্রকৃতির কাজই হচ্ছে নানান রকম রহস্য সৃষ্টি করা--মানুষের কাজ হচ্ছে সেই রহস্যের কুয়াশা সরিয়ে দেয়া। এমন একদিন কি আসবে যখন কেউ বলবে না--দেয়ার আর মেনি থিংকস ইন হেভেন্ অ্যাণ্ড আর্থ ···।

'আরে মিসির আলি সাহেব না? এখানে কী করছেন? একা-একা ক্লাসে বসে আছেন কেন?'

তিনি দাড়িওয়ালা এই লোকটাকে চিনতে পারলেন না। হাতে রেজিস্ট্রি খাতা, কাজেই অধ্যাপক হবেন। মুখখানা হাসি-হাসি। পান খেয়ে দাঁত লাল করে ফেলেছেন। পান-খাওয়া লোকজন কি কিছুটা নম্র স্বভাবের হয়? মিসির আলির মনে হল পান এবং স্বভাবের ভেতর কোনো-একটা সম্পর্ক আছে। তিনি যে ক' জন পানবিলাসী লোককে চেনেন, তাদের সবাই সদালাপী।

'কি, কথা বলছেন না কেন? কিছু ভাবছেন নাকি?'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত ও নরম স্বরে বললেন, 'জ্বি না, কিছু ভাবছি না।

'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'জ্বি না।'

দাড়িওয়ালা অধ্যাপক অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। মিসির আলি বিব্রত বোধ করলেন। কাউকে চিনতে পারছি না বলা--তাকে প্রায় অপমান করার শামিল। বিশেষ করে অধ্যাপক শ্রেণীর মানুষরা এ ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর।

'সত্যি চিনতে পারছেন না?'

'জ্বি না। আমার একটা প্রবলেম আছে, কিছুই মনে থাকে না।'

'মাসখানেক আগে আমি আপনার কাছে এক জন রোগী নিয়ে গিয়েছিলাম--ফিরোজ নাম। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনি ফিরোজের দুলাভাই।'

'হ্যাঁ দুলাভাই।'

'এবং আপনার নাম হচ্ছে নাজিমুদ্দিন। হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট।'

'এই তো চিনতে পারছেন।'

'চিনতে পারছি এসোসিয়েশন থেকে। একটা মনে পড়লে, অন্যগুলো মনে পড়তে থাকে। এসোসিয়েশন অব আইডিয়াস।'

'ফিরোজ তো অনেকখানি ইমপ্রুভ করেছে। এত অল্প সময়ে যে আপনি এতটা করবেন, আমরা কেউ কল্পনাও করি নি। দারুণ ব্যাপার।'

মিসির আলি কিছু বললেন না। ফিরোজ আজ বিকেলে তাঁর কাছে আসবে। প্রতি সোমবার ফিরোজের সঙ্গে তাঁর একটি সেশন হয়। অথচ নীলুকে বলে রেখেছেন, আজ যাবেন তাদের বাসায়। তাঁর কাজকর্ম ইদানীং এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন? বয়স বাড়ছে।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি?'

'চলুন, লাউঞ্জে বসে চা খাওয়া যাক।'

'চলুন।'

'আপনি এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন? কী ভাবছেন এত?'

'কিছু ভাবছি না।'

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। দীর্ঘনিঃশ্বাসটি কেন ফেললেন, এই নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন। অকারণে তো কেউ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে না। সবকিছুর পেছনেই কারণ থাকে। এই জগতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না, সবই লজিক। জটিল লজিক। জটিল কিন্তু অভ্রান্ত। লজিকের বাইরে এক চুলও কারোর যাবার ক্ষমতা নেই।

২

গত দু' মাস ধরে ফিরোজ প্রতি সোমবারে মিসির আলির কাছে আসে। পাঁচটার সময় আসে, থাকে সাতটা পর্যন্ত। আজ কী মনে করে তিনটার সময় চলে এসেছে। মিসির আলি তখনো ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরেন নি। তাঁর কাজের মেয়ে হানিফা দরজা খুলে দিল। সে দরজা খুলল ভয়ে-ভয়ে। ফিরোজের দিকে তাকালেই তার বুক টিপটিপ করে। বড় ভয় লাগে।

'স্যার কি আছেন, হানিফা?'

'জ্বি না।'

'আজ একটু সকাল-সকাল এসে পড়েছি। আমি বসি, কেমন?'

'জ্বি আইচ্ছা।'

'তুমি আমাকে এক গ্লাস লেবুর শরবত খাওয়াতে পার? প্রচণ্ড গরম।'

হানিফার বয়স দশ। কিন্তু সে খুবই চটপটে। মিসির আলি সাহেব তাকে অল্পদিনের মধ্যেই বর্ণপরিচয় করিয়েছেন। পড়াশোনার ব্যাপারে তার অসম্ভব আগ্রহ। মেয়েটি এমনিতেও চটপটে। সে বড় এক গ্লাস শরবত বানাল। তিন টুকরা বরফ ছেড়ে দিল। ট্রেতে করে শরবতের গ্লাস এবং আরেক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে গেল। সে দেখেছে শরবত খাবার পরপরই সবাই পানি খেতে চায়।

ফিরোজ অবশ্যি উল্টোটা করল। পানি খেল প্রথমে। তারপর বেশ সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তুমি আমাকে ভয় পাও কেন হানিফা?'

'ভয় পাই না তো।'

'পাও, খুবই ভয় পাও। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি এখন সেরে গেছি। পুরোপুরি না সারলেও অসুখটা আর নেই। চেঁচামেচি হৈচৈ কিছুই করি না। ঠিক না?'

'জ্বি ঠিক।'

'এখন দেখ না--সবাই একা-একা ছেড়ে দেয়। আগে ছাড়ত না।'

হানিফা কিছু বলল না।

'ফ্যানটা ছেড়ে দাও।'

হানিফা ফ্যান ছেড়ে দিল। ফিরোজ ভারি গলায় বলল, 'এই গরমে সুস্থ মানুষই পাগল হয়ে যায়। আর আমি তো এমনিতেই পাগল।'

হানিফার বুকের ভেতর ধক করে উঠল। বলে কী এই লোক! বাড়িতে আর কেউ নেই। শুনশান নীরবতা। হানিফার ইচ্ছা করতে লাগল, বাড়ির বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

'হানিফা।'

'জ্বি?'

'আমাকে ভয় লাগছে?'

'জ্বি।'

'ভয়ের কিছু নেই। আমি সেরে গেছি। ঠিক আছে--তুমি যাও। আমি বসে থাকব চুপচাপ।'

হানিফা রান্নাঘরে চলে গেল। কি মনে করে সে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। কেন জানি দারুণ ভয় করতে লাগল তার।

ফিরোজ বসে আছে চুপচাপ। তার চোখ ঈষৎ লাল। খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও তার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। ছেলেটির বয়স বাইশ, অত্যন্ত সুপুরুষ। চিবুক এবং ঠোঁট কিশোরীদের মতো। বড় বড় চোখ, পাতলা নাক। তাকে দেখলে মনে হয়, মেয়ে বানাতে গিয়ে প্রকৃতি কী মনে করে শেষ মুহূর্তে তাকে পুরুষ বানিয়েছে, এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কিছু কাঠিন্য ঢেলে দিয়েছে।

ফিরোজের সমস্যাটা শুরু হয় এইভাবে--সে দু'বছর আগে জানুয়ারি মাসে তার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। যাবার উদ্দেশ্য ছিল একটাই--গ্রাম দেখা। ফিরোজ কখনো গ্রাম দেখে নি।

বন্ধুর বাড়ি ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে। চমৎকার একটা জায়গা। ভোরবেলায় আকাশের গায়ে নীলাভ গারো পাহাড় দেখা যায়। চারদিকে ধু-ধু প্রান্তর, বর্ষা আসামাত্র যা পানিতে ডুবে যায়। সেই পানি সমুদ্রের মতো গর্জন করতে থাকে। অল্প বাতাসেই সমুদ্রের মতো বিশাল ঢেউ ওঠে।

এখন অবশ্যি শুকনো খটখট করছে চারদিকে। তবু ফিরোজ মুগ্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে মুগ্ধ হল বন্ধুর বাড়ি দেখে--বিশাল এক দালান। সিনেমাতে পুরনো আমলের জমিদার বাড়ির মতো বাড়ি। একেকটি ঘর এত উঁচু এবং এত বিশাল যে, কথা বললেই প্রতিধ্বনি হয়।

ফিরোজের বন্ধুর নাম আজমল চৌধুরী। সে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ি দেখাল। অতিথিদের থাকবার জায়গা। নায়রীদের থাকবার জায়গা। কুয়োতলা। বাড়ির পেছনের সারদেয়াল, যেখানে পূর্বপুরুষদের কবর আছে। ফিরোজের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কী কাণ্ড! সে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'এ তো হুলস্থুল ব্যাপার রে আজমল! তোরা রাজা-মহারাজা ছিলি--তা তো কোনোদিন বলিস নি।'

'এখন কিছুই নেই। দালানটাই আছে, আর কিছুই নেই। সেই দালানই ভেঙে ভেঙে পড়ছে। আরেকটা ভূমিকম্প হলে গোটা দালানই ভেঙ্গে পড়ে যাবে। তাছাড়া খুব সাপের উপদ্রব।'

'বলিস কি!'

'এখন ভয় নেই কোনো। সব সাপ হাইবারনেশনে চলে গেছে। গরমের সময় ভয়াবহ কাণ্ড হয়।'

'কোনো ব্যবস্থা করতে পারিস না?'

আজমল কঠিন স্বরে বলল, 'এর একটামাত্র ব্যবস্থাই আছে, সব ছেড়ে-ছুড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া।'

'এত চমৎকার ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি, বলিস কি?'

'চলে যাব। এখানে থাকলে মারা পড়তে হবে। তিনটা মাত্র মানুষ আমরা। আমি, মা আর আমার ছোটবোন। এত বড় বাড়ি দিয়ে আমি করব কি? জঙ্গল হয়ে গেছে চারদিকে, দেখছিস না?'

দু' দিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে ফিরোজ গিয়েছিল, কিন্তু পঞ্চম দিনেও সে ফেরার কথা কিছু বলল না।

বড় আনন্দে সময় কাটতে লাগল। গ্রাম যে এত ইন্টারেস্টিং হবে, তা তার ধারণার বাইরে ছিল। শুধু একটি খটকা লেগে থাকল তার মনে। আজমলের বোনের সঙ্গে তার দেখা হল না, যদিও মেয়েটি এই বাড়িতেই থাকে। মেয়েটির নাম--নাজ। আজমলের মা প্রায়ই তাঁর মেয়েকে চিকন গলায় ডাকেন, 'ও নাজ, ও নাজ।' তার উত্তরে মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে সাড়া দেয়। মেয়েটির সাড়া শব্দ এইটুকুই। ফিরোজ একবার ভেবেছিল, আজমলকে তার বোনের কথা জিজ্ঞেস করে। শেষ পর্যন্ত তা করা হয় নি। প্রাচীনপন্থী

একটি পরিবার, হয়তো কিছু মনে করে বসবে। এদের হয়তো কঠিন পর্দার ব্যাপার আছে।

ষষ্ঠ দিন সন্ধ্যায় মেয়েটির সঙ্গে ফিরোজের দেখা হয়ে গেল। ফিরোজ অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলা। চারদিক অন্ধকার। ঘরে আলো দিয়ে যায় নি। ফিরোজ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেই হকচকিয়ে গেল। সতের–আঠার বছরের একটি মেয়ে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে একটি হারিকেন। হারিকেনের আলো পড়েছে মেয়েটির মুখে। এই মুখ কি কোনো মানবীর মুখ? অসম্ভব। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত রূপ কি এই মুখে আঁকা নয়? ফিরোজ চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইল-- পারল না। সে তাকিয়েই রইল।

মেয়েটি বলল, 'আমি নাজনীন।'

কিছু–একটা বলতে হয়। ফিরোজ বলতে পারল না। কোনো কথা তার মনে এল না। এই অসম্ভব রূপবতী মেয়েটিকে সে কী বলবে?

'ভাইয়া বাজারে গেছে, এসে পড়বে। আপনি বড় ঘরে বসুন--চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ফিরোজ বড় ঘরের দিকে রওনা হল আচ্ছন্নের মতো, এবং সে মনে করতে পারল না মেয়েটির গায়ে শাড়ি ছিল, না সালোয়ার–কামিজ ছিল। মেয়েটির চুল কি বেণী–বাঁধা ছিল, না খোলা ছিল। তার মুখটি কি গোলাকার, না লম্বাটে। কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে একটি তুলি দিয়ে আঁকা মুখ সে দেখে এসেছে। যে–শিল্পী ছবিটি এঁকেছেন তাঁর বাস এ পৃথিবীতে নয়--অন্য কোনো ভুবনে।

রাতে খাবার সময় আজমল সহজ স্বরে বলল, 'নাজের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে, তাই না? নাজ বলছিল।'

ফিরোজ কিছু বলল না। আজমল বলল, 'ও কিছুতেই তোর সামনে আসতে চাচ্ছিল না। দেখাটা সে জন্যেই এমন হঠাৎ হয়েছে।'

'আসতে চাচ্ছিল না কেন?'

'লজ্জা। ওর পোলিওতে একটা পা নষ্ট। এই লজ্জায় সে কারো সামনে পড়তে চায় না।'

আজমলের মুখ কঠিন হয়ে গেল। সে রুক্ষ স্বরে বলল, 'পৃথিবীর সমস্ত লজ্জা তার মধ্যে। শুধু তোর সামনে কেন, কারো সামনেই সে যায় না।'

সমস্ত রাত ফিরোজ এক ফোঁটা ঘুমতে পারল না। এত কষ্টের রাত তার জীবনে আসে নি। এবং ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটল পরদিন দুপুরে।

সে একা–একা শিয়ালজানি খালের পাড় ধরে হাঁটতে গেল। এবং তার এক ঘন্টার মধ্যেই চার–পাঁচ জন লোক তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। তার চোখ লাল টকটক করছে। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। কথাবার্তা অসংলগ্ন। মাঝে–মাঝে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠছে এবং দৌড়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।

আজমল এবং তার মা হতভম্ব। নাজনীন সমস্ত ব্যাপার দেখে অনবরত কাঁদছে। বাড়ি ভর্তি হয়ে গেছে মানুষে। নানান জল্পনা-কল্পনা। খারাপ বাতাস লেগেছে। জ্বীনে ধরেছে। কালির আছর হয়েছে।

ফিরোজকে নিয়ে আসা হল ঢাকায়। সারিয়ে তুললেন মিসির আলি সাহেব। সেই সারানর ব্যাপারটা সাময়িক। কিছুদিন সুস্থ থাকে, আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। লোকজনদের গলা টিপে ধরতে চায়। জিনিসপত্র ভেঙে একাকার করে।

তবে এখন অবস্থা অনেক ভালো। অসুস্থতার সময় আগের মতো ভায়োলেন্ট হয় না। চুপ করে থাকে। কারো সংঙ্গে কথাবার্তা বলে না। খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে বসে থাকে। ঘর থেকে শুধু বিড়বিড় শব্দ শোনা যায়। যেন সে কারো সঙ্গে কথা বলছে।

যখন সে সুস্থ থাকে, তখন তার অসুস্থ অবস্থার কথা বিশেষ মনে থাকে না। মিসির আলি সাহেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যা বের করেছেন, তা খাতায় লিখে রেখেছেন। লেখা হয়েছে ফিরোজের জবানীতে।

অসুস্থতার বিবরণ

সারা রাত নানান কারণে আমার ঘুম হয় নি। শেষ রাতের দিকে একটু ঘুম এল। তাও অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। ছ'টার সময় বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখি, আজমল একটা চাদর গায়ে দিয়ে আমবাগানে রোদের জন্যে অপেক্ষা করছে। চট করে রোদ উঠবে মনে হল না। কারণ খুব কুয়াশা। আমি লক্ষ্য করেছি, আটটা-ন'টার আগে এ অঞ্চলে সূর্যের দেখা পাওয়া যায় না।

আজমল আমাকে দেখে বলল, 'আজ এত সকাল-সকাল উঠলি যে? চোখ লাল কেন? রাতে ঘুম হয় নি।?'

'হয়েছে।'

'চা খাবি এক কাপ? নাশতা হতে দেরি হবে। চাল কোটা হচ্ছে, পিঠা হবে। সময় লাগবে।'

'চা এক কাপ খাওয়া যায়।'

চা খেতে খেতে পাখি শিকার নিয়ে কথা হল। এখান থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে পুকইরা বিলে নাকি খুব হাঁস নামছে। শেষ রাতে উঠে গেলে প্রচুর পাওয়া যাবে।

আমি হাঁস মারার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখালাম, কিন্তু আজমলের কাছ থেকে কোনোরকম সাড়া পাওয়া গেল না। অথচ এখানে যার সঙ্গেই দেখা হয়, সেই জিজ্ঞেস করে পাখি শিকার করতে এসেছি কিনা। আজমলের এ রকম অনাগ্রহের কারণ নাশতা খাবার সময় টের পাওয়া গেল। এদের পাখি মারার কোনো বন্দুক বর্তমানে নেই। একটা দোনলা উইনস্টন গান ছিল। অর্থনৈতিক কারণে বিক্রি করে ফেলতে হয়েছে। শিকারের প্রসঙ্গ উঠতেই এই কারণেই আজমল মন খারাপ করেছে। আমার নিজেরও

তখন একটু খারাপ লাগল। শিকারের প্রসঙ্গটা না তুললেই হত।

রোদ উঠল দশটার দিকে। আমি ভেবেছিলাম আজমলের সঙ্গে বাজারের দিকে যাব। কিন্তু আজমল বলল, 'তুই থাক, আমি দেখি একটা বন্দুকের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

আমি বললাম, 'বন্দুকের ব্যবস্থা করার কোনো দরকার নেই। শিকারের দিকে আমার কোনো ঝোঁক নেই।'

আজমল আমার কোনো কথা শুনল না। সে অসম্ভব জেদি। আমাকে রেখে চলে গেল। আমার তেমন কিছু করার নেই। শিয়ালজানি খাল ধরে ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

এ অঞ্চলে হিন্দু বসতি খুব বেশি। এদের ঘর–দুয়ার খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখতে ভালো লাগে। তবে অনেক বাড়ি–ঘর দেখলাম ফাঁকা। আজমলের কাছে শুনেছি, অনেক হিন্দু পরিবার একাত্তুরের যুদ্ধে কলকাতা গিয়ে আর ফিরে আসে নি। বেশ কিছু মারা পড়েছে পাকিস্তানী আর্মির হাতে। এদের ঘর–বাড়ি ফাঁকা। বড় বড় ঘাস জন্মেছে। জনমানবশূন্য বাড়ি–ঘর দেখতে কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। গা ছমছম করে।

আমি ঠিক করলাম বাড়ি ফিরে যাব। চড়চড় করে রোদ উঠছে। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দুর চলে এসেছি। যে জায়গাটায় আছি, তা অসম্ভব নির্জন। আমি বিশাল একটা বকুল গাছের নিচে দাঁড়ালাম খানিকক্ষণ। তখনই ব্যাপারটা ঘটল। গরগর একটা শব্দ শুনলাম গাছে। যেন কেউ গাছের ডাল নাড়াচ্ছে। আমি চমকে গাছের দিকে তাকাতেই রক্ত হিম হয়ে গেল।

দেখলাম, গাছের ডালে এক জন মানুষ বসে আছে। খালি গা। পরনে একটা প্যান্ট। চোখে গোল্ড রিম একটা চশমা। লোকটি রোগা এবং দারুণ ফর্সা। মুখের ভাব অত্যন্ত রুক্ষ। সে সাপের মতো সরসর করে নেমে এল। এক জন মানুষ গাছ থেকে নেমে আসার মধ্যে তেমন অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু আমার শরীর কাঁপতে লাগল। ঘামে গা চটচটে হয়ে গেল। লোকটির দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ। চশমার কাঁচের আড়ালেও তার চোখ চকচক করছে। সে এক পা এক পা করে এগিয়ে এল আমার দিকে। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা করছিল ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু আমার পা যেন মাটিতে লেগে গেছে। নড়বার সামর্থ্য নেই। লোকটির কাছ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবারও ক্ষমতা নেই। সে এগিয়ে এল আমার দিকে, তারপর একটা চড় বসিয়ে দিল। এর পরের ঘটনা আমার আর কিছুই জানা নেই।

মিসির আলি সাহেব তাঁর ছোট ছোট অক্ষরে প্রচুর নোট লিখেছেন। প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠার একটি বিশ্লেষণী প্রবন্ধও আছে ইংরেজিতে লেখা। কিছু পয়েন্টস আছে আন্ডারলাইন করা। দু'––একটি পয়েন্ট এ রকম :

১। ফিরোজের গল্পে বেশ কিছু মজার ব্যাপার আছে। সে চশমা–পরা একটি লোককে নেমে আসতে দেখল খালি গায়ে। কিন্তু তার পরনে আছে প্যান্ট। যে লোকটি চশমা এবং প্যান্ট পরে, সে খালি গায়ে থাকে না। লুঙ্গি পরা একটি লোক খালি গায়ে নেমে এলে বাস্তব চিত্র হত। ফিরোজ দেখেছে একটি অবাস্তব চিত্র। অবাস্তব

চিত্রগুলো আমরা দেখি স্বপ্নে। ফিরোজ কি একটি স্বপ্নদৃশ্যের বর্ণনা করছে?

২। ফিরোজ বলছে লোকটির পরনে ছিল প্যান্ট। কিন্তু প্যান্টের রঙ কী, তা সে বলতে পারছে না। তার মানে কি এই যে, প্যান্টের কোনো রঙ ছিল না। স্বপ্নদৃশ্য সবসময় হয় সাদা–কালো। স্বপ্ন বর্ণহীন। অবশ্যি সে একটি রঙ স্পষ্ট উল্লেখ করছে। সেটি হচ্ছে চশমার ফ্রেমের রঙ। সে বলছে গোল্ড রিম চশমা। অর্থাৎ সে সোনালী রঙ দেখতে পাচ্ছে, স্বপ্ন দৃশ্যে যা সম্ভব নয়।

৩। তার গল্পের কোথাও সে নাজনীন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নি। আমার মনে হচ্ছে, ফিরোজের সমস্ত ব্যাপারটায় নাজনীনের একটি ভূমিকা আছে। অসুস্থ হবার আগের রাত সে অনিদ্রায় কাটিয়েছে। অনিদ্রার মূল কারণ রূপবতী একটি মেয়ে। আমি লক্ষ করেছি, আমার সঙ্গে কথাবার্তার সময়ও সে এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যায়। কেন যায়?

৪। সে তার গল্পে বলেছে, সে একটি বকুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু যে–গাছের নিচে সে দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা একটা বট গাছ। ফিরোজ বকুল গাছ এবং বট গাছের পার্থক্য জানবে না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে গাছের নিচে আসার আগেই একটি ঘোরের ভেতর ছিল বলে আমার ধারণা। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস বকুল গাছ প্রসঙ্গে তার কোনো একটি পীড়াদায়ক স্মৃতি আছে। (পরে বকুল গাছ প্রসঙ্গে আরো তথ্যাদি আছে)।

৫। ফিরোজের চশমা–পরা লোকটি ছিল ফর্সা, রোগা ও লম্বা, যার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বর্ণনা আজমলের বেলায়ও খাটে। এই ছেলেটি অসম্ভব ফর্সা, রোগা এবং লম্বা। সে অবশ্যি চশমা পরে না, মেডিকেল কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময় তার চশমা ছিল। এবং সেটা ছিল গোল্ড রিম চশমা। সেই সময় ফিরোজ এবং আজমল ছিল রুমমেট।

ফিরোজ প্রসঙ্গে ইংরেজিতে কিছু নোটস্ আছে। নোটস্গুলোর বঙ্গানুবাদ দেয়া হল :

বকুল গাছ বিষয়ে কয়েকটি কথা

আমার প্রাথমিক অনুমান ছিল বকুল গাছ প্রসঙ্গে ফিরোজের একটি পীড়াদায়ক স্মৃতি আছে। অনুমান মিথ্যা নয়। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ফিরোজরা একসময় সিলেটের মীরবাজারে থাকত। তার বাসা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটি বকুল গাছ ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খুব ভোরবেলায় বকুল ফুল কুড়াতে যেত।

ফিরোজের বয়স তখন আট বছর। সে তার বড় বোনের সঙ্গে এক ভোরবেলায় ফুল কুড়াতে গিয়ে একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখল। একটি নগ্ন যুবতীর মৃতদেহ দড়িতে ঝুলছে। এটি একটি হত্যাকান্ড। মেয়েটিকে মেরে দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

অল্পবয়স্ক একটি শিশুর কাছে নগ্ন নারীদেহ এমনিতেই যথেষ্ট অস্বাভাবিক। সেই দেহটি যদি প্রাণহীন হয়, তাহলে তা সহ্য করা মুশকিল।

ফিরোজ অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রবল জ্বর এবং ডেলিরিয়াম। শৈশবের এই দৃশ্য

ফিরোজের মস্তিষ্কের নিউরোনে জমা আছে, তা বলাই বাহুল্য।

মিসির আলি সাহেব বাড়ি ফিরলেন পাঁচটা বাজার কিছু পরে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ক্ষণেক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। ঝাঁকে–ঝাঁকে কাক উড়ছে আকাশে। ঝড় হবে সম্ভবত। পশু–পাখিরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর আগে আগে পায়।

ঘরে ঢুকে যে দৃশ্যটি দেখলেন, তার জন্যে মিসির আলির মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। ফিরোজ বসে আছে মূর্তির মতো। তার হাতে একটা লোহার রড। সে শক্ত হাতে রড চেপে ধরে আছে। এত শক্ত করে চেপে ধরে আছে যে, তার হাতের আঙুল সাদা হয়ে আছে। চামড়ার নিচের শিরা নীল হয়ে ফুলে উঠেছে।

রড সে পেল কোথায়? এই প্রশ্নটির উত্তর পরে ভাবলেও হবে। ঠিক এই মুহূর্তে তাঁকে বুঝতে হবে, ফিরোজ এ রকম আচরণ কেন করছে। তিনি সহজ স্বরে বললেন, 'একটু দেরি করে ফেললাম। তুমি কি অনেকক্ষণ হয়েছে এসেছ নাকি?'

ফিরোজ জবাব দিল না। তার চোখ টকটকে লাল। নিঃশ্বাস ভারি। কী সর্বনাশের কথা! মিসির আলি প্রাণপণে চেষ্টা করলেন স্বাভাবিক থাকতে।

'বুঝলে ফিরোজ, খুব ঝড়–বৃষ্টি হবে। আকাশ অন্ধকার হয়েছে মেঘে। তোমার হাতে ওটা কি লোহার রড নাকি?'

'হুঁ।'

'লোহার রড নিয়ে কী করছ? দাও রেখে দিই।'

'না।'

'চা–টা কিছু খেয়েছ?'

ফিরোজ কোনো জবাব দিল না। তার দৃষ্টি তীব্র ও তীক্ষ্ণ।

'সিগারেট খাবে? নাও একটা সিগারেট ধরাও।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, ফিরোজ রড ছেড়ে দিয়ে হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। মনে হচ্ছে একটা ভয়াবহ বিপর্যয় এড়ান গেছে। সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সিগারেট শেষ হতে লাগবে তিন মিনিট। তিন মিনিট যথেষ্ট দীর্ঘ সময়।

'তোমার জ্বর নাকি ফিরোজ?'

ফিরোজ জবাব দিল না। মিসির আলি তার কপালে হাত দিলেন। গা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। মিসির আলি বললেন, ''হুঁ, বেশ জ্বর তো। একটা ট্যাবলেট খেয়ে নাও, জ্বরটা কমবে।'

তিনি ড্রয়ার খুলে এক শ' মিলিগ্রাম লিব্রিয়ামের ট্যাবলেট বের করলেন। অত্যন্ত কড়া ঘুমের অষুধ। কোনো রকমে খাইয়ে দিতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবে। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে গিয়ে ধরবে। মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ কমে আসবে। উত্তেজিত অংশগুলোর উত্তেজনা দ্রুত হ্রাস পাবে। লিব্রিয়াম একটি চমৎকার অষুধ।

'নাও ফিরোজ, খেয়ে নাও।'

ফিরোজ কোনো রকম আপত্তি ছাড়াই অষুধ খেয়ে ফেলল। রক্তে অষুধ মেশবার জন্যে সময় দিতে হবে। বেশি নয়, অল্প কিছু সময়। এই সময়টা গল্পগুজবে আটকে রাখতে হবে।

'চা খেলে কেমন হয় ফিরোজ? বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে চা-টা জমবে মনে হয়। খাবে?'

'হুঁ খাব।'

'বস, আমি চা নিয়ে আসছি। কিংবা এক কাজ কর। শুয়ে পড় সোফায়--আরাম কর।'

মিসির আলি বেরিয়ে এলেন। শোবার ঘরের দরজা লাগিয়ে এলেন বারান্দায়। এখন তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। ফিরোজকে বারান্দায় এলে দরজা ভেঙে আসতে হবে। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এর মধ্যেই লিব্রিয়াম তার কাজ করতে শুরু করবে।

মিসির আলি ডাকলেন, 'হানিফা, হানিফা।'

হানিফা রান্নাঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এল। ভয়ে আতঙ্কে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। সে কাঁপছে থরথর করে।

'কি হয়েছিল হানিফা?'

হানিফা কিছু বলতে পারল না। আতঙ্ক এখনো তাকে ঘিরে আছে। মিসির আলি সাহস দেবার জন্যে হানিফার মাথায় হাত রাখলেন। হানিফা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'এই লোকটা একটা লোহার শিক লইয়া আমারে মারতে আইছিল।'

'তারপর?'

'আমি দরজা বন্ধ কইরা বইসা ছিলাম। তারপর শুনি সে কার সাথে যেন কথা কইতেছে।'

'কার সাথে কথা বলছে?'

'অন্য একটা মানুষ।'

'তুমি দেখেছ অন্য কোনো মানুষ?'

'জ্বি না, কিন্তু কথা শুনছি। মোটা গলা।'

'ঠিক আছে এখন যাও, ভালো করে এক কাপ চা বানাও। ভয়ের কিছু নেই।'

হানিফা চা বানাতে গেল। মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটির পা এখনো কাঁপছে। চা বানাতে বানাতে ঠিক হয়ে যাবে। ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, কোনো-একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

মিসির আলি ঘড়ি দেখলেন। দশ মিনিট পার হয়েছে। লিব্রিয়াম নিশ্চয়ই তার কাজ শুরু করেছে। বসার ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসছে না। এখন নিশ্চিন্তে সেখানে যাওয়া যায়।

তিনি বসার ঘরে ঢুকলেন। ফিরোজ লোহার রড হাতে বসে আছে। অসুখের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। তিনি শুকনো গলায় বললেন, 'চা বানাতে বলে এসেছি। চা চলে আসবে।'

ফিরোজ চাপা গলায় বলল, 'আজ আপনার একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার কথা।'

মিসির আলির চমকে ওঠা উচিত, কিন্তু তিনি চমকে উঠলেন না। তিনি জানেন, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মানুষের টেলিপ্যাথিক সেন্স প্রবল হয়ে ওঠে। ফিরোজের এখন সেই অবস্থা। সে ব্যাখ্যার অতীত কোনো-একটি উপায়ে তাঁর মস্তিষ্কের বায়ো-কারেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে।

'একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার দেখা করবার কথা না?'

'হ্যাঁ, কথা আছে।'

'তার কাছে গেলে আপনার বিপদ হবে।'

'কী করে বুঝলে?'

'আমাকে বলে গেছে।'

'কে বলে গেছে? ঐ চশমাপরা লোক?'

'হ্যাঁ।'

মিসির আলি লক্ষ করলেন ফিরোজের চোখের পাতা ঘনঘন পড়তে শুরু করেছে। REM--র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট। লিব্রিয়াম কাজ করতে শুরু করেছে।

তিনি সহজ স্বরে বললেন, 'শোন ফিরোজ, আমি আমার সারা জীবনে আমার নিজের লাভ-ক্ষতির দিকে তাকাই নি। আমি ঐ মেয়েটির কাছে যাব।'

ফিরোজ ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। ফিরোজকে যাবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন তার বাবা-মা।

মিসির আলি ড্রাইভারকে নিয়ে ধরাধরি করে ঘুমন্ত ফিরোজকে গাড়িতে তুলে দিলেন। ড্রাইভারকে বললেন, 'ও অসুস্থ। আজ রাতটা ওকে তালাবন্ধ করে রাখতে হবে। সকালবেলা আমি ওকে দেখতে যাব। আর শোন, ও রাতে বিড়বিড় করে কথা-টথা বলবে। একটা ক্যাসেট রেকর্ডারের ব্যবস্থা করতে বলবে, যাতে ওর সমস্ত কথাবার্তা রেকর্ড হয়ে যায়। এটা খুব দরকার।'

ড্রাইভার শুকনো মুখে তাকিয়ে রইল। মিসির আলি ঘরে পা দিতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। সেই সঙ্গে বাতাস। এ রকম দুর্যোগের রাতে নীলুর কাছে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। মিসির আলি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন।

ফিরোজের ব্যাপারে তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ এ রকম হবে কেন?

৩

বহু খোঁজাখুঁজি করেও মিসির আলি নীলুদের বাড়ি বের করতে পারলেন না। তাঁর কাছে কোনো ঠিকানা নেই। তিনি ইচ্ছা করেই ঠিকানা রাখেন নি। না রাখাটা বোকামি

হয়েছে। কাঁঠালবাগানের যে-অঞ্চলে লাল রঙের দোতলা বাড়ি থাকার কথা, সেখানে লাল রঙের কোনো বাড়িই নেই।

কয়েকটি পান-বিড়ির দোকানদারকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন--লাল রঙের দোতলা বাড়ি, ভেতরে ফুলের বাগান আছে। ওরা যখন শুনল তিনি ঠিকানা জানেন না এবং বাড়ির মালিকের নামও জানেন না, তখন খুবই অবাক হয়ে গেল।

'ঢাকা শহরে ঠিকানা দিয়াও বাড়ি পাওন যায় না, আফনে আইছেন ঠিকানা ছাড়া। কেমুন লোক আফনে!'

মিসির আলির নিজেরও মনে হল, কাজটা বুদ্ধিমানের মতো হয় নি। স্মৃতির উপর বিশ্বাস করতে নেই। স্মৃতি হচ্ছে প্রতারক। নানানভাবে সে মানুষকে প্রতারণা করে।

অন্য কোনো মানুষ হলে এতক্ষণ খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে বাড়ি চলে যেত। কিন্তু তিনি ভিন্ন ধরনের মানুষ। কোনো-একটি বিষয় শেষ না দেখে তিনি ছাড়েন না। কাজেই সকাল দশটার সময় তাঁকে দেখা গেল একটা রিকশা ঠিক করতে। ঘন্টা হিসাবে চুক্তি। এক ঘন্টা সে মিসির আলিকে নিয়ে কাঁঠাল বাগানের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরবে। তিনি বাড়ি বের করতে চেষ্টা করবেন।

মিসির আলির কোলে রসমালাইয়ের একটা হাঁড়ি। কি মনে করে যেন তিনি এক সের রসমালাই কিনে ফেলেছেন। ছাত্রীর বাড়িতে খালি হাতে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এখন মিষ্টির হাঁড়িটা একটা উপদ্রবের মতো লাগছে। মিসির আলির কেন যেন মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে হাঁড়ি ভেঙে তার সমস্ত শরীর মাখামাখি হয়ে যাবে।

রিকশাওয়ালাটা বুড়ো এবং চালাক। খুব কম পরিশ্রমে সে এক ঘন্টা পার করতে চায়। রিকশা চলছে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে। মিসির আলি বললেন, 'বুড়ো মিয়া, আপনি এ যে আস্তে আস্তে রিকশা চালাচ্ছেন, এতে কিন্তু আপনার কষ্ট বেশি হচ্ছে। প্রতিবারই নতুন করে মোমেনটাম দিতে হচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি জোরে চালাতেন, তাহলে মোমেনটামের জন্যে বল দিতে হত একবার। বাকি সময়টা শুধু ফ্রিকশন কাটানর জন্যে অল্প কিছু বল লাগত।

বুড়ো রিকশওয়ালাকে এই জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত করতে পারল না। তার রিকশার গতি আরো শ্লথ হয়ে গেল।

মিসির আলি ভাবতে চেষ্টা করলেন, যে বাড়িতে আগে একবার এসেছেন, সে-বাড়িটি এখন খুঁজে না পাওয়ার পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে। অনেকগুলো কারণ হতে পারে। পরবর্তী সময়ে হয়তো লাল রঙের দালানটিকে সাদা রঙ করা হয়েছে। দোতলা ছিল, তিনতলা করা হয়েছে। ফুলের বাগান নষ্ট করে ঘর তোলা হয়েছে। কিংবা এ-ও হতে পারে যে, মস্তিষ্কের যে-অংশ বস্তুজগতের আবস্থানিক বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করে নিউরোন স্মৃতিকক্ষে জমা রাখে--তাঁর সেই অংশ কাজ করছে না।

মিসির আলি হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর রসমালাইয়ের হাঁড়ি দু'খণ্ড হয়েছে। সমস্ত গায়ে, রিকশার সীটে এবং নিচে রসে মাখামাখি। এই অবস্থায় নীলুর বাসা খোঁজার

কোনো মানে হয় না। অথচ এক ঘন্টা পার হতে এখনো পনের মিনিট বাকি। পনের মিনিট আগে রিকশা ছেড়ে দেবারও প্রশ্ন ওঠে না। তিনি রিকশওয়ালাকে ছায়ায় নিয়ে রিকশা দাঁড় করাতে বললেন।

রসে মাখামাখি হয়ে তিনি পনের মিনিট রিকশার সীটে বসে রইলেন। মিষ্টির লোভে তাঁর মাথার ওপর কাক ডাকতে লাগল। দু'-একটা সাহসী কাক ছোঁ মেরে মেরে রসগোল্লার টুকরা ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। বুড়ো রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে। সে তার জীবনে এমন বিচিত্র যাত্রী খুব বেশি পায় নি। মিসির আলি বললেন, 'পনের মিনিট পার হলেই আমি চলে যাব, বুঝলেন?'

রিকশাওয়ালা মাথা নাড়ল-–সে বুঝেছে।

আজ গরম সে রকম নেই। কাল রাতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আজ একটা শীতল ভাব আছে। তাছাড়া রাস্তাঘাট ঝকঝক করছে। গাছপালায় সতেজ ভাব। কচুরিপানার মতো হালকা বেগুনি ফুল ফুটে আছে জারুল গাছে। কী চমৎকার যে লাগছে দেখতে। এই ফুলগুলোর জন্যেই চারদিকে একটা কোমল ভাব চলে এসেছে।

মিসির আলি বাসায় ফিরলেন এগারটার সময়। বাসায় এক ফোঁটা পানি নেই। একটার দিকে বাড়িওয়ালা কল ছাড়বে। তার আগে গোসলের কোনো সম্ভাবনা নেই। রসমালাইয়ের রস সারা গায়ে মেখে বসে থাকতে হবে।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। হানিফাকে চা বানাতে বলে ফিরোজের ফাইল খুলে বসলেন। এই ফাইলটিতে লেখা: ফিরোজ/মোহনগঞ্জ। মোহনগঞ্জে ফিরোজের অভিজ্ঞতা এবং মোহনগঞ্জ প্রসঙ্গে যাবতীয় খবরাখবর এখানে আছে। তিনি মোহনগঞ্জের বিভিন্ন লোকজনের কাছে যে-সব চিঠি পত্র লিখেছেন, তার কপি এবং সেই সব চিঠিপত্রের জবাবও এখানে আছে।

মিসির আলি পাতা উল্টাতে লাগলেন। প্রথম চিঠিটি নাজনীনকে লেখা। তারিখ দেয়া আছে ১৭-৬-৮৫, প্রায় এক বছর আগে লেখা চিঠি। আজ হচ্ছে ১০-৬-৮৬। মিসির আলি নিজের লেখা চিঠির উপর চোখ বোলাতে লাগলেন।

নাজনীন,

কল্যাণীয়াসু, আমার ভালবাসা নাও। পরিচয় দিয়ে নিচ্ছিঃ আমি মিসির আলি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিষয়ের এক জন অধ্যাপক। ফিরোজ খান নামের এক জন মানসিক রোগীর চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত। তাকে চিকিৎসা করা হচ্ছে মেডিস্টিক সাইকোথেরাপি পদ্ধতিতে। এই রোগীকে তুমি চেন। ও তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল এবং সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তোমাদের বাড়িতেই। শোন নাজনীন--মানসিক রোগের উৎপত্তি মনে। মানুষের মন বিচিত্র জিনিস। সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জে যে রহস্য ও জটিলতা আছে, তার চেয়েও অনেক বেশি রহস্যময় মানুষের মন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে সেই রহস্যের জট খুলতে চেষ্টা করি। প্রায় সময়ই তা সম্ভব হয় না।

ফিরোজের বর্তমান যে অবস্থা, তার কারণ অনুসন্ধান করতে তোমার সাহায্য প্রয়োজন। একটি অসুস্থ ছেলের সাহায্যে তুমি কি এগিয়ে আসবে না? আমি যা জানতে চাই, তা হচ্ছে--ফিরোজের সঙ্গে তোমার ক'বার দেখা হয়েছে এবং কী কী কথা হয়েছে। কোনো কিছু বাদ না দিয়ে আমাকে জানাবে। আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন তথ্যও অর্থবহ হতে পারে। আমার শরীরটা বিশেষ ভালো না। শরীর একটু ভালো হলে তোমাদের বাড়িটা দেখতে যাব। এই ব্যাপারে তোমারই বড় ভাই আজমলের সাথে কথা হয়েছে। আদর ও ভালবাসা নাও।

মিসির আলি

চিঠির উত্তর তিনি এক সপ্তাহের ভেতর পেয়ে গেলেন। তিনি মুগ্ধ হলেন চিঠি পড়ে। সহজ এবং আন্তরিক ভঙ্গিতে লেখা চিঠি। হাতের লেখা বড় সুন্দর। তার চিঠির অংশবিশেষ এ রকম--

'ভাইয়া যে তার বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে আসবে, তা আমি জানতাম। গরমের ছুটির সময় এসে বলে গিয়েছিল। ভাইয়া সেই কলেজে পড়ার সময় থেকে তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বেড়াতে আসে। আমাদের বাড়িটা বিশাল। ভাইয়া তার বন্ধুদের এই বাড়ি দেখিয়ে মুগ্ধ করতে চায় বলেই আমার ধারণা।

যাই হোক, ভাইয়ার বন্ধুরা এলে আমার খুব ভালো লাগে। বাড়িতে একটা উৎসব উৎসব ভাব থাকে। ভাইয়ার মেজাজ থাকে খুব খারাপ (আপনি বোধ হয় জানেন না, ভাইয়া খুব রাগী)।

এবার যখন ফিরোজ ভাই বেড়াতে এল--আমার মোটেও ভালো লাগে নি। কারণ ভাইয়ার এই বন্ধুকে এখানে নিয়ে আসার পেছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল, যা আমার পছন্দ হয় নি। ভাইয়া চাচ্ছিল, আমি তার বন্ধুর সঙ্গে গল্প-টল্প করি, চা-টা বানিয়ে দিই। এবং তা করলেই তার বন্ধু আমাকে পছন্দ করে ফেলবে। আমার শারীরিক ত্রুটি তার চোখে পড়বে না। আমার একটি ভালো বিয়ে হবে। ভাইয়ার ধারণা, তার এই বন্ধু পৃথিবীর সেরা মানুষদের এক জন।

মার কাছ থেকে এসব শুনে আমার খুব মন খারাপ হল। একটি ছেলেক ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিয়ে করতে হবে কেন? বিয়েটা কি এতই জরুরী? আমি ভাইয়াকে ডেকে নিয়ে বললাম, 'আমি কখনো, কোনো অবস্থাতেই তোমার এই বন্ধুর সামনে যাব না।' ভাইয়া চোখ লাল করে বলল, 'যেতেই হবে।' আমি শান্ত গলায় বললাম, 'এটা নিয়ে তুমি যদি জোর খাটাও, আমি তাহলে মরে যাব।' ভাইয়া চুপ করে গেল। আমি শান্ত ধরনের মেয়ে। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ভয়ঙ্কর জেদি। ভাইয়া তা খুব ভালোই জানে। সে আমাকে ঘাঁটাল না। আমি ভেতরের বাড়িতে থাকতে লাগলাম। ভুলেও বাইরে পা বাড়াই না। তবু একদিন সন্ধ্যায় দেখা হয়ে গেল। ফিরোজ ভাইকে দেখে মনে হল, তিনি খুব অবাক হয়েছেন। আমি হকচকিয়ে গিয়েছি। নিজেকে সামলে নিয়ে কোনোমতে বললাম, 'বড় ঘরে গিয়ে বসুন সেখানে চা দেয়া হবে।'

এই বলে আমি চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছি। পোলিওর জন্যে আমার এক পায়ে কোনো জোর নেই, কাজেই উল্টে পড়ে গেলাম। ফিরোজ ভাই আমাকে টেনে তুললেন। এটাই স্বাভাবিক। এতে লজ্জা বা অপমানের কিছুই নেই। কিন্তু রেগে গেলাম এবং কঠিন গলায় বললাম, 'হাত ছাড়ুন।'

তিনি পাংশুবর্ণ হয়ে গেলেন। আমার হাত ছেড়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।'

মিসির আলি এই চিঠিটা বেশ অনেকবার পড়েছেন এবং প্রতিবারই তাঁর মনে হয়েছে, 'চমৎকার একটি চিঠি। আন্তরিক এবং কোনো ভান নেই। এক জন মানুষ সবচেয়ে বেশি ভান করে তার চিঠিতে। যে এই ভানের ওপরে উঠে আসতে পারে, তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হয়।

সুন্দরী একটি মেয়ের মনটাও বোধ হয় সুন্দর হয়।

মিসির আলি অন্যমনস্কভাবে খাতার পাতা উল্টাতে লাগলেন। এখনো পানি আসে নি। আজ কি বাড়িওয়ালা তার পানির পাম্পটি খুলবে না? ওদের নিজেদের কি পানির দরকার হয় না? দুপুরের খাওয়া–দাওয়ারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়। রান্নাবান্না কিছু হয় নি। হানিফা জ্বরে কাতর। কালকের ঘটনায় বেচারী বেশ ভয় পেয়েছে। সকালে এক শ' এক জ্বর ছিল, এখন এক শ' দুই। দুটি প্যারাসিটামল কিছুক্ষণ আগেই খাওয়ান হয়েছে। জ্বর কমে যাওয়া উচিত, কিন্তু কমছে না। বিকেল নাগাদ না কমলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

তিনি খাতাপত্র গুছিয়ে উঠলেন। উঁকি দিলেন হানিফার ঘরে। হানিফার জন্যে তিনি একটি ঘর দিয়েছেন। এই ঘরে ছোট্ট একটি খাট আছে, পড়ার চেয়ার–টেবিল আছে, একটি আলনা আছে। এই মেয়েটি কোনোদিন কল্পনাও করে নি, কোনোদিন এতগুলো জিনিস তার হবে।

'হানিফা, তোর জ্বর কেমন রে?'

'ভালো।'

মিসির আলি কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন।

'ভালো কোথায়? অনেকখানি জ্বর তো! মাথায় পানি ঢালতে হবে।'

হানিফা জ্বরতপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল। এই লোকটিকে সে বুঝতে পারছে না। এক জন কাজের মেয়ের জন্যে কেউ এতটা দরদ দেখায়, না দেখান উচিত?

'হানিফা।'

'জ্বি?'

'জ্বর খুব বেশি। জ্বর নামাতে হবে। পানি তো বোধ হয় এক ফোঁটাও নেই।'

'জ্বি না।'

'যাই, বাড়িওয়ালাকে পাম্প ছাড়তে বলি।'

'বলেন।'

'ফিরোজদের বাড়ি থেকে কেউ এসেছিল?'

'জ্বি না।'

'টেলিফোন করে একটা খোঁজ নিতে হয়। কি বলিস হানিফা?'

'জ্বি নেন।'

হানিফা চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার জ্বর বোধ হয় বাড়ছে। চোখ ছোট ছোট হয়ে এসেছে। চোখের সাদা অংশ কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছে। মিসির আলি চিন্তিত মুখে বাড়িওয়ালার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

বাড়িওয়ালা করিম সাহেব বাসাতেই ছিলেন। পানি এখনো ছাড়া হয় নি শুনে তিনি খুব হৈচৈ করতে লাগলেন। বারবার বললেন, 'এই সামান্য কাজের জন্যে আপনি নিজে আসলেন প্রফেসর সাহেব--বড় লজ্জায় ফেললেন আমাকে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

মিসির আলি সাহেব বললেন, 'একটা টেলিফোন করা যাবে করিম সাহেব?'

'একটা কেন, এক শ'টা করা যাবে। যখন ইচ্ছা তখন করা যাবে। দরকার হলে ট্রাংকল করবেন--খুলনা ময়মনসিংহ বরিশাল। টেলিফোনের বিল আবদুল করিমকে কিছু করতে পারবে না, বুঝলেন প্রফেসর সাহেব? ওরে, টেলিফোনটা প্রফেসর সাহেবকে এনে দে। আর দেখ ঠাণ্ডা পেপসি বা সেভেন আপ কিছু আছে কিনা।'

'কিছু লাগবে না।'

'আপনি না বললেই হবে নাকি? আপনার একটা ইজ্জত আছে না? ছয় মাসে এক বছরে একবার আসেন। আমি বলতে গেলে রোজই বসে থাকি আপনার ওখানে। আপনি ফ্যানটার নিচে ঠাণ্ডা হয়ে বসেন তো দেখি।'

মিসির আলি বসলেন। বাড়িওয়ালা করিম সাহেব মিসির আলিকে একটু বিশেষ রকম স্নেহ করেন। গত দু'বছরে তিনি প্রতিটি ফ্ল্যাটের ভাড়া তিন দফায় বাড়িয়েছেন, শুধু প্রফেসর সাহেবের ভাড়া এক পয়সাও বাড়ে নি। কেন বাড়ে নি কে জানে?

ফিরোজের মাকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। তাঁর কাছ থেকে যে-সমস্ত তথ্য জানা গেল, সেগুলো হচ্ছে--ফিরোজ ভালো আছে, সুস্থ এবং স্বাভাবিক। তার ঘরে একটি মাইক্রোফোন বসিয়ে ঘরের যাবতীয় শব্দ টেপ করা হয়েছে। টেপগুলো তিনি সন্ধ্যাবেলা পাঠাবেন।

ফিরোজের মা চিন্তিত স্বরে বললেন, 'আপনি অসুস্থ বলেছিলেন কেন? আমরা খুব ভয়ে ভয়ে রাতটা কাটালাম। আপনার ওখানে সে কিছু করেছিল নাকি?'

'না, তেমন কিছু করে নি। একটু উদ্‌ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। ফিরোজ কি আছে ঘরে?'

'হ্যাঁ আছে। কথা বলবেন?'

'বলব। দিন ওকে।'

ফিরোজের গলা শান্ত ও স্বাভাবিক।

'কেমন আছ ফিরোজ?'

'ভালো।'

'কি করছিলে?'

'কিছু করছিলাম না। একটা উপন্যাস নিয়ে বসেছিলাম।'

'কার উপন্যাস?'

'জন স্টেইনবেক। নাম হচ্ছে গিয়ে আপনার, সুইট থার্সডে। স্যার, আপনি পড়েছেন এটা?'

'গল্প-উপন্যাস আমি পড়ি-টড়ি না। এক জন লেখকের বানান দুঃখ-কষ্টের বিবরণ পড়ে কী হয় বল? এমনিতেই আমাদের চারদিকে প্রচুর দুঃখ-কষ্ট আছে!'

'স্যার, আপনাকে বইটা পড়তেই হবে। আমার পড়া শেষ হলেই আপনাকে দিয়ে আসব।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। শোন ফিরোজ।'

'বলুন।'

'কাল রাতে তোমার কেমন ঘুম হয়েছিল?'

'ভালো।'

'কি রকম ভালো?'

'খুব ভালো। এক ঘুমে রাত পার করেছি। কি জন্যে জিজ্ঞেস করছেন স্যার?'

'এমনি জানতে চাচ্ছি। কোনো স্পেসিফিক কারণ নেই। তুমি কি কাল রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ?'

'জ্বি না স্যার।'

'চট করে না বলে দিও না। চিন্তা করে তারপর বল।'

'এবার ও সময় নিল জবাব দেয়ার আগে।'

'একটা স্বপ্ন দেখেছি। আর ওটা তো আমি প্রায়ই দেখি।'

'কোনটা?'

'ঐ যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছি, তারপর দেখি কোনো প্রশ্নের উত্তর জানি না।'

'এটা ছাড়া আর কোনো স্বপ্ন দেখ নি?'

'জ্বি না।'

'শোন ফিরোজ, এছাড়াও যদি অন্য কোনো স্বপ্নের কথা মনে পড়ে, আমাকে জানিও।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তুমি কি আজ সন্ধ্যার দিকে একবার আসবে?'

'না স্যার, আজ আসব না। বইটা শেষ করব।'

'প্রেমের উপন্যাস নাকি?'

ফিরোজ লাজুক স্বরে বলল, 'হুঁ।'

টেপগুলো পরীক্ষা করতে করতে রাত তিনটা বেজে গেল। প্রথম চারটি টেপে তেমন কিছু নেই। একবার শুধু কিছুক্ষণের জন্যে আহ্ উহ্ শব্দ। সেটা স্বপ্ন দেখার

জন্যে, কিংবা বেকায়দা অবস্থায় শোয়ার জন্যে। তবে শেষ টেপটিতে মিসির আলির জন্যে বড় ধরনের বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

তিনি বিচিত্র একটি কণ্ঠস্বর শুনলেন সেখানে। তীক্ষ্ণ তীব্র। হাই ফ্রিকোয়েন্সি-- কথাগুলো এ রকম :

অপরিচিত কণ্ঠস্বর : 'হুঁ হুঁ ফিরোজ! ফিরোজ --- (অস্পষ্ট)

ফিরোজের কণ্ঠস্বর : 'না। না। উঁহু না।

অপরিচিত : লোহার রডটা কোথায়?

ফিরোজ : জানি না, আমি জানি না।

অপরিচিত : (অস্পষ্টভাবে কিছু বলল)। নিঃশ্বাসের শব্দ।

ফিরোজ : না। না। না।

অপরিচিত : লোহার রড। রড।

ফিরোজ : না। না।

অপরিচিত : (অস্পষ্টভাবে কিছু কথা)। হাসির শব্দ।

মিসির আলি অসংখ্যবার এই অংশটি বাজিয়ে বাজিয়ে শুনলেন। অস্পষ্ট অংশগুলো উদ্ধার করতে পারলেন না। অপরিচিত যে-কণ্ঠস্বর শুনছেন, তা ফিরোজরই কণ্ঠস্বর। এটি তার একটি দ্বিতীয় সত্তা। সেকেণ্ড পারসোনালিটি। ফিরোজকে পুরোপুরি সুস্থ করতে হলে তার দ্বিতীয় সত্তাটিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে।

হানিফা ছটফট করছে। তার জ্বর কমে নি। এখন এক শ' দুইয়েরও কিছু বেশি। মিসির আলি চিন্তিত বোধ করলেন। রাত দশটার দিকে জ্বর অনেক কম ছিল। নিরানব্বই পয়েন্ট পাঁচ। এখন এত বাড়ল কেন?

হানিফা জেগে আছে। কিন্তু কোনো রকম সাড়াশব্দ করছে না। মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, 'খারাপ লাগছে নাকি রে বেটি?'

'না।'

'মাথার যন্ত্রণা আছে?'

'আছে।'

'বেশি?'

'জ্বি।'

'মাথা টিপে দেব?'

হানিফা লজ্জিত স্বরে বলল, 'জ্বি না।'

'না কেন? আরাম লাগবে। তার আগে মাথায় পানি ঢেলে জ্বরটা কমাতে হবে।'

তিনি বাথরুমে ঢুকলেন পানির বালতির খোঁজে। তাঁর নিজের শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। মাথা ভার ভার লাগছে। বমি-বমি লাগছে। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু একটি বাচ্চা মেয়ে জ্বরে ছটফট করবে, আর তিনি শুয়ে থাকবেন--এটা হয় না।

হানিফার এ বাড়িতে আসার ইতিহাস বেশ বিচিত্র। গত বছর জুলাই মাসের দিকে

একবার বেশ বড় একটা ঝড় হল। রাত একটায় জেগে উঠে দেখেন, দড়ামদুড়ুম শব্দে জানালার পাট আছড়ে পড়ছে। বৃষ্টির ছাটে ঘর ভেসে যাচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। চারদিক অন্ধকার। মোটামুটি একটি ভয়াবহ অবস্থা। তিনি জানালা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলেন আট ন' বছরের একটা বাচ্চা একা–একা দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে।

'কে রে তুই?'

মেয়েটি ভয় পাওয়া স্বরে বলল, 'আমি।'

'এখানে কি করছিস?'

'ঘুমাইতাছি।'

'জেগে জেগে ঘুমাচ্ছিস নাকি?'

মেয়েটি জবাব দিল না।

'বাপ–মা কোথায়?'

'তোর বাবা–মা নাই।'

'আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?'

'না।'

'তুই কি এ রকম একা–একা মানুষের বারান্দায় ঘুমোস নাকি?'

মেয়েটি জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, 'ভয় লাগছে না তোর?'

'না।'

'বলিস কি! নাম কি তোর?'

'হানিফা।'

'আয়, ভেতরে আয়। ইস, ভিজে জবজবে হয়ে গেছিস তো!'

'মিসির আলি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে তাকালেন মেয়েটির দিকে। ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে কাটা চুল। আদুরে একটা মুখ।

'তোর বাপের নাম কি?'

'জানি না।'

'বলিস কি! মা'র নাম?'

'জানি না।'

'তোর হাতে কি? মুঠোর ভেতর কি আছে?'

হানিফা মুঠি খুলল। ভাংতি পয়সা।

'ভিক্ষা করে পেয়েছিস?'

'হুঁ।'

মিসির আলি গুনলেন। দু'টাকা ত্রিশ পয়সা। এই বিশাল পৃথিবীতে আগামীকাল এই মেয়েটি যাত্রা শুরু করবে––দু' টাকা ত্রিশ পয়সা, একটা নোংরা ফ্রক এবং একটা তালি দেয়া প্যান্ট নিয়ে। কোনো মানে হয়?

তিনি একটি শুকনো লুঙ্গি বের করলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'কাপড় বদলে এটা পরে ফেল। নিউমোনিয়া বাধাবি তো। ঐ ঘরে একটা বিছানা আছে, ওখানে গিয়ে

শুয়ে থাক।

মিসির আলি ভেবেছিলেন, সকাল হলেই সে চলে যেতে ব্যস্ত হয়ে যাবে। একবার যাযাবর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে বন্ধন আর ভালো লাগে না। কিন্তু হানিফা সকালবেলা চলে যাবার কোনো রকম লক্ষণ দেখাল না। এমনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যেন এইটি তার ঘরবাড়ি।

হানিফার প্রতি সমাজের যে দায়িত্ব ছিল, মিসির আলি তা পালন করেছেন। নিজেই তাকে পড়তে শিখেয়েছেন। যোগ ভাগ গুণ শিখিয়ে নিয়ে গেছেন স্কুলে ভর্তি করাবার জন্যে। কেউ ভর্তি করাতে রাজি হয় নি। এত বড় মেয়েকে ক্লাস ওয়ানে অ্যাডমিশন দেয়ান সম্ভব নয়। তিনি হানিফাকে বলেছেন, 'ঠিক আছে, তুই ঘরে বসেই পড়াশোনা চালিয়ে যা। যথাসময়ে প্রাইভেটে তোকে দিয়ে ম্যাট্রিক দেওয়াব। আমি নিজে তো সব সময় দেখতে পারি না। এক জন মাস্টার রেখে দেব।'

শেষ রাতের দিকে হানিফার জ্বর কমে এল। শরীর ঘামতে লাগল। সে বিড়বিড় করে নানান কথা বলতে লাগল। মেয়েটির বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো থেকেই মিসির আলি বড় ধরনের একটি আবিষ্কার করলেন। তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

এই প্রসঙ্গে যথা সময়ে বলা হবে।

৪

সাইকোলজি বিভাগের সভাপতি ডঃ সাইদুর রহমানের মেজাজ সকাল থেকেই খারাপ। মেজাজ খারাপের প্রধান দুটি কারণের একটি হচ্ছে--সুইডেনে একটি কনফারেন্সে তাঁর যাবার খুব শখ ছিল, কিন্তু আমন্ত্রণ আসে নি। তিনি চেষ্টা তদবিরের তেমন কোনো ত্রুটি করেন নি। যেখানে একটা চিঠি দেয়ার দরকার, সেখানে তিনটি চিঠি দিয়েছেন। প্রফেসর নোয়েল বার্গকে বাংলাদেশের হস্তশিল্পের নমুনা হিসাবে একটি চটের ব্যাগ পাঠিয়েছেন, যেটা কিনতে তাঁর তিন শ' টাকা লেগেছে। রাজশাহীতে তৈরি খুব ফ্যান্সি ধরনের ব্যাগ। প্রফেসর নোয়েল বার্গ একটি চিঠিতে ব্যাগের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু বহু প্রতীক্ষিত নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠান নি।

সাইদুর রহমান সাহেবের মেজাজ খারাপের দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে--মিসির আলি সংক্রান্ত সমস্যা। মিসির আলি লোকটিকে তিনি মনেপ্রাণে অপছন্দ করেন। পার্টটাইম টিচার হিসেবে মিসির আলির অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিপক্ষে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। লাভ হয় নি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেব বলেছেন, কোনো পোস্ট অ্যাডভারটাইজ হওয়ামাত্র তাঁকে নেয়া হবে। সাইদুর রহমান সাহেব গত দু'বছরে কোনো পোস্ট অ্যাডভারটাইজড হতে দেন নি। এড-হক ভিত্তিতে এক জনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন।

তাঁর ধারণা ছিল এড-হক অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে মিসির আলি হৈচৈ করবেন। কিন্তু মিসির আলি কিছুই করেন নি। এটাও একটা রহস্য। এই লোকটির কি জীবনে উন্নতি করবার কোনো রকম ইচ্ছা নেই, না তার সবটাই ভান?

মিসির আলির ওপর আজ ভোরবেলায় তাঁর রাগ চরমে উঠেছে। কারণ তিনি দেখেছেন, সুইডেন থেকে মিসির আলির নামে একটি খাম এসেছে। তাঁর ধারণা, এটা কনফারেন্সের নিমন্ত্রণপত্র। কারণ প্রেরকের নামের জায়গায় প্রফেসর নোয়েল বার্গের নাম আছে। প্রফেসর নোয়েল বার্গ হচ্ছেন কনফারেন্সের আহবায়ক।

সাইদুর রহমান সাহেব অফিসে খোঁজ নিলেন--মিসির আলি এসেছেন কি না। জানা গেল তিনি এসেছেন। কাজেই সুইডেনের সেই খাম নিশ্চয়ই খোলা হয়েছে। সাইদুর রহমান সাহেব হেড ক্লার্ককে বললেন, 'মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাহলে বলবেন, আমি খোঁজ করছিলাম।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'তাঁকে তো খুঁজেই পাওয়া যায় না। ডিপার্টমেন্টে আসেন না নাকি?'

'ক্লাস না থাকলে আসেন না।'

'গতকাল এসেছিলেন?'

'জ্বি, গতকাল এসেছিলেন। এক জন ছাত্রীর ঠিকানা খুঁজে বের করবার জন্যে খুব হৈচৈ করলেন।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার। নীলুফার ইয়াসমিন। সে দেড় বছর ধরে ইউনিভার্সিটিতে আসে না, এখন তার ঠিকানা খোঁজার জন্যে যদি অফিসের সব কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হয়, তাহলে তো মুশকিল।'

'কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হবে কেন? এসব পার্সোনাল কাজের জন্যে তো অফিস না। আপনি স্ট্রেইট বলে দেবেন।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'তাছাড়া এক জন টিচার ছাত্রীর ঠিকানার জন্যে ব্যস্ত হবে কেন? এসব ঠিক না। নানান রকমের কথা উঠতে পারে।'

মিসির আলি ভেবেই পেলেন না, ইউনিভার্সিটির এক জন ছাত্রীর ঠিকানা বের করা এত সমস্যা হবে কেন? অফিসে নেই। অফিস থেকে বলা হল, সমস্ত রেকর্ডপত্র ডীন অফিসে। ডীন অফিসে গিয়ে জানলেন রেকর্ডপত্র আছে রেজিস্ট্রার অফিসে। রেজিস্ট্রার অফিসে যে কেরানি এসব ডীল করে, দু'ঘন্টা অপেক্ষা করেও তার দেখা পাওয়া গেল না। সকালবেলা সে নাকি এসেছিল। চা খেতে গিয়েছে। মিসির আলি রেজিস্ট্রার অফিসের ক্যান্টিনেও খুঁজে এলেন। দেখা পাওয়া গেল না। আবার আসতে হবে আগামীকাল।

ডিপার্টমেন্টে ফিরে এসে শুনলেন--সাইদুর রহমান সাহেব তাঁকে খোঁজ করেছেন।

মিসির আলি বিস্মিত হলেন। সাইদুর রহমান সাহেব তাঁকে পছন্দ করেন না। বড় রকমের প্রয়োজনেও তাঁর খোঁজ করেন না। আজ করছেন কেন?

'স্লামালিকুম স্যার।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আপনি কি আমার খোঁজ করছিলেন?'

'বসুন মিসির আলি সাহেব। আছেন কেমন?'

'ভালো।'

মিসির আলি বসলেন।

'কি জন্যে ডেকেছিলেন?'

'তেমন কিছু না।'

সাইদুর রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। সুইডেনের চিঠির প্রসঙ্গ তুলবেন কিনা বুঝতে পারলেন না। তুললেও এমনভাবে তুলতে হবে, যাতে এই লোক বুঝতে না পারে, তিনি এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী।

মিসির আলি বললেন, 'স্যার, আপনি কি কিছু বলবেন?'

'তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু না। সুইডেনের কনফারেন্সের খবর কিছু জানেন? মানে আমার যাবার কথা ছিল। পেপারের অ্যাবস্ট্রাক্ট পাঠিয়েছিলাম প্রফেসর নোয়েলের কাছে।'

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, 'আমি ওদের ইনভাইটেশন পেয়েছি। পেপার দেবার জন্যে বলছে।'

'তাই নাকি?'

সাইদুর রহমান সাহেব নিভে গেলেন। টেনে টেনে বললেন, 'যাচ্ছেন কবে নাগাদ? এক সপ্তাহের ভেতরই তো রওনা হওয়া উচিত?'

'আমি যাচ্ছি না স্যার।'

'কেন?'

'আমার কাজের মেয়েটি অসুস্থ।'

সাইদুর রহমান সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কাজের মেয়ে অসুস্থ, এই জন্যে সে সুইডেন যাবে না। বদ্ধ উন্মাদ নাকি।

'কাজের মেয়ে অসুস্থ, সেই কারণে যাচ্ছেন না?'

'ওটা একটা কারণ। তাছাড়া অন্য একটি কারণ আছে।'

'জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন। আমি এক জন রোগীর মনোবিশ্লেষণ করছি। এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'সত্যি বলছেন?'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'মিথ্যা বলব কেন?'

'আপনি কি আপনার ডিসিশন ওদেরকে জানিয়েছেন?'

'আজই তো মাত্র চিঠি পেলাম।'

'তবু আপনার উচিত ইমিডিয়েটলি আপনার ডিসিশন ওদের জানান। হয়তো ওদের কোনো অলটারনেট ক্যানডিডেট আছে।'

'স্যার, আপনার কি সেখানে যাবার ইচ্ছা ? ইচ্ছা থাকলে বলেন।'

'বলব মানে, আপনি কী করবেন?'

'নোয়েল আমার বন্ধুমানুষ। ইংল্যাণ্ডে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমার তিনটা পেপার আছে, যেখানে নোয়েল হচ্ছে এক জন কো-অথর। আপনার বোধ হয় চোখে পড়ে নি।'

সাইদুর রহমান সাহেবের মুখ তেতো হয়ে গেল। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, 'সুইডেন কি একটা যাওয়ার মতো জায়গা? আছে কি সেখানে বলুন? দেখার কিছু আছে? কিছুই নেই। একটা ফালতু জায়গা।'

'দেখাদেখিটা তো ইম্পর্টেন্ট নয়। সেমিনারটাই প্রধান। সারা পৃথিবী থেকে জ্ঞানীগুণীরা আসবেন।'

'ঐসব কচকচানি শুনে কোনো লাভ হয়? কোনোই লাভ হয় না। শুধু বড় বড় কথা।'

'এটা ঠিক বললেন না। সেখানে যাঁরা আসবেন, তাঁরা কথার চেয়ে কাজ অনেক বেশি করেন। বিশেষ করে এমন কিছু লোকজন আসবেন, যাঁদের দেখলে পূণ্য হয়।'

'আপনিও তো ওদের নিমন্ত্রিত, তার মানে বলতে চাচ্ছেন, আপনাকে দেখলেও পূণ্য হবে?'

মিসির আলি একটু হকচকিয়ে গেলেন। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তা হবে। আপনি অনেকক্ষণ আমাকে দেখলেন। অনেক পূণ্য করলেন। উঠি স্যার?'

ডঃ সাইদুর রহমান বহু কষ্টে রাগ সামলালেন। মনে-মনে এমন কিছু গালাগালি দিলেন, যা তাঁর মতো অবস্থার ব্যক্তিরা কখনো দিতে পারে না। এর মধ্যে একটি গালি ভয়াবহ।

৫

বছরখানেক হল নীলুর বাবা জাহিদ সাহেবের স্বাস্থ্য দ্রুত ভাঙতে শুরু করেছে। এমন কিছু অসুখ তাঁকে ধরেছে, যা শুধু কষ্টকর নয়, অত্যন্ত বিরক্তিকর। কিছুই হজম হয় না। পানি মেশান দুধ, লেবুর রস দিয়ে বার্লি, এক স্লাইস রুটি বা শিং মাছের মশলাবিহীন ঝোল--কিছুই না। ডাক্তার প্রায় সবই দেখান হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন, লিভার কাজ করছে না। ডাক্তারদের শুকনো ধরনের কথাবার্তা, ইতস্তত ভাবভঙ্গি থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে--অসুখটা জটিল। হয়তো-বা লিভার ক্যানসার-ট্যানসার বাধিয়ে বসেছেন। ডাক্তররা সরাসরি তাঁকে কিছু বলেন না। তিনিও জিজ্ঞাসা করতে

ঠিক সাহস পান না। নীলুর সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তেমন কোনো কথাবার্তা বলে না। তিনি কিছু একটা বলতে শুরু করলে মন দিয়ে শোনে, কিন্তু কথার মাঝখানে এমন একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে বসে যে, তাঁর ধারণা হয় নীলু আসলে কিছু শুনছে না। শুধু তাকিয়েই আছে।

নীলুকে ইদানীং তিনি ভয় করেন। যে-নীলু তাঁর সঙ্গে থাকে, তাকে তাঁর নিজের মেয়ে বলে কখনো মনে হয় না। এ যেন একটি অচেনা মেয়ে-যাকে কোনোদিনই ঠিক চেনা যাবে না।

অবশ্যি নীলু তাঁর সঙ্গে একেবারেই যে কথাবার্তা বলে না, তা নয়। কথাবার্তা বলে। এসে জিজ্ঞেস করে, 'চা লাগবে বাবা?' এই পর্যন্তই। তিনি যদি বলেন লাগবে, তাহলে সে উঠে গিয়ে চা বানিয়ে কাজের ছেলেটির হাতে পাঠিয়ে দেবে। যদি বলেন লাগবে না, তাহলে চুপ করে যাবে। দ্বিতীয় কোনো কথা বলবে না।

জাহিদ সাহেব আজকাল তাঁর দ্বিতীয় মেয়েটির অভাব খুব অনুভব করেন। সে পাশে থাকলে বাসার অবস্থা হয়তো আরেকটু স্বাভাবিক হত। বিলুর বিয়েটা তিনি ভালো দিতে পারেন নি। অথচ তখন মনে হয়েছিল, কী চমৎকার একটি ছেলে। তিনি বারবার জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি দেশে চলে আসবে তো বাবা? বিদেশে সেটল করবে না তো? আমি আমার মেয়েকে দেশান্তরী করতে চাই না। আমি একা মানুষ, আমি চাই আমার দুটি মেয়ে আমার আশেপাশেই থাকবে।'

বিলুর বর হাসিমুখে বলেছে, 'বিদেশে সেটল করব কেন? কী আছে ওখানে? মানুষ হিসেবে কোনো দাম আছে আমাদের? আমি বছরখানেক থাকব। কিছু টাকা-পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরব। মাথা গুঁজবার মতো একটা বাড়ি তো কিনতে হবে।

জাহিদ সাহেব ছেলের কথা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু এখন জানতে পেরেছেন, সে মনটানাতে একটা বাড়ি কিনেছে। যে-ছেলে দেশে চলে আসবে, সে নিশ্চয় বিদেশে বাড়ি কেনে না। তাছাড়া, বিলু সুখী হয় নি বলে তাঁর ধারণা। বিলুর চিঠিপত্রে অবশ্য কিছু লেখা থাকে না। কিন্তু চিঠিগুলো প্রাণহীন। যেন লেখার জন্যেই লেখা। দায়িত্ব পালনের চিঠি। এক জন সুখী মেয়ের চিঠিতে থাকবে আনন্দের ছবি। সে তার বরের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখবে। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে উচ্ছ্বাস থাকবে। সে-সব কিছু থাকে না। বাবা হিসেবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। সৎপাত্রে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারেন নি। অথচ ছেলেটিকে সত্যি সত্যি তাঁর পছন্দ হয়েছিল। ভদ্র ছেলে। চমৎকার কথাবার্তা। দারুণ শার্প। সেই সঙ্গে রসিক। খাওয়ার টেবিলে একবার সে এক গল্প শুরু করল। এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে এক ভণ্ড তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছে। হাজার হাজার মানুষ জড় হয়েছে তর্কযুদ্ধ দেখতে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মঞ্চে বসে আছেন--ভণ্ড পণ্ডিত ঢুকল এবং গম্ভীর হয়ে বলল--'ফুন ফুনাফুন?' দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি তাঁর সারাজীবনে--'ফুন ফুনাফুন' বলে কিছু শোনেন নি। এর মানে কী, তা তাঁর জানা নেই।

ভারি মজার গল্প। জাহিদ সাহেব গল্প শুনে হাসতে হাসতে বিষম খেলেন। নীলুর

মতো গম্ভীর মেয়েও হেসে ফেলল। এই কি সেই ছেলে?

জাহিদ সাহেব আজকাল বেশির ভাগ সময়ই বারান্দায় বসে এইসব কথা ভেবে ভেবে কাটান। দু'-তিনটে পত্রিকা তাঁর হাতের কাছে থাকে, সে-সব পড়া হয় না। পনের খন্ড মুক্তিযুদ্ধের দলিল কিনেছেন। শখ ছিল গোড়া থেকে পড়বেন, তা পড়তে পারছেন না। ইচ্ছা করে না। মাঝে মাঝে শুধু অষ্টম খন্ডে চোখ বুলিয়ে যান। অষ্টম খন্ড হচ্ছে অত্যাচার ও নির্যাতনের কাহিনী। পড়তে পড়তে তাঁর বুক হুহু করে।

আজও তাই করছিলেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন, নীলু তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নীলু নিঃশব্দে চলাফেরা করে। হঠাৎ উপস্থিত হয়ে চমকে দেয়। জাহিদ সাহেব বললেন, 'কি খবর মা?'

'কোনো খবর নেই বাবা।'

'কোথাও বেরুচ্ছিস?'

'না।'

নীলু বসল তাঁর পাশের চেয়ারে। তিনি লক্ষ করলেন, নীলু বেশ সাজগোজ করেছে। কপালে টিপ। সুন্দর একটি শাড়ি। খোঁপায় ফুল পর্যন্ত দিয়েছে। জাহিদ সাহেব বললেন, 'তোর স্যার তো আর এলেন না।'

'উনি এসেছিলেন। বাড়ি চিনতে পারেন নি। রিকশা করে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে দু'বার গেলেন।'

'তুই দেখছিস?'

নীলু কিছু বলল না। সে দেখে নি। না দেখেই বলেছে। খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু জাহিদ সাহেব জানেন অস্বাভাবিক হলেও এটা সত্যি। নীলু না দেখেই অনেক কিছু বলতে পারে। কেমন করে পারে, তা তিনি জানেন না। জানতে চানও না। নীলুর এই অস্বাভাবিক ক্ষমতাকে তিনি ভয় করেন।

কোনোদিন ভোরবেলায় নীলু এসে যদি বলে, 'বাবা, আজ তোমার দিনটি ভালো যাবে। আজ বিলুর চিঠি পাবে।'

তিনি হাসতে চেষ্টা করেন, কিন্তু হাসি ঠিক আসে না।

'চিঠির সঙ্গে ছবিও পাবে। সুন্দর সুন্দর ছবি পাঠিয়েছে বিলু।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

নীলু হাসে। এই নীলু আগের নীলু নয়। এই নীলুকে তিনি চেনেন না।

জাহিদ সাহেব বললেন, 'তোর স্যার এসেছিলেন, তাঁকে ডেকে ঘরে আনলি না কেন?'

'উনি নিজেই খুঁজে বের করবেন। আমাদের এই স্যার কোনো জিনিসই মাঝপথে ছেড়ে দেন না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। খুব মেথডিকেল মানুষ। তোমার সঙ্গে তো বাবা ওঁর সাথে একবার দেখা

হয়েছিল।'

'আমার মনে নেই।'

নীলু হাসতে হাসতে বলল, 'স্যারটা খুব আনইমপ্রেসিভ। তাঁর কথা মনে না থাকারই কথা।'

জাহিদ সাহেব নীলুর গলায় এক ধরনের আবেগ অনুভব করলেন। এই আবেগের কারণ কি? তিনি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললেন, 'খুব গরম পড়েছে এ বছর।'

নীলু বলল, 'প্রতি বছর গরমের সময় তুমি এই কথাটা বল। আবার শীতের সময় বল--এ বছর মারাত্মক শীত পড়েছে। বল না বাবা?'

'বলি বোধ হয়।'

'আমরা বেঁচে থাকি বর্তমানকে নিয়ে। অতীতের কথা আমাদের কিছু মনে থাকে না।'

কথাটা কি ঠিক? না, ঠিক নয়। কিছু কিছু অতীত তার কালো সীল শক্ত করে বসিয়ে দেয়, কিছুতেই তা তুলে ফেলা যায় ন। নীলুর বিয়ের চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি প্রথম তা লক্ষ করলেন। যে-কোনো আলাপ অল্প কিছুদূর এগোনর পরই বরপক্ষের লোকজন জানতে পেরে যায়, তাঁর এই মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল একটি বাড়িতে। যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে এক জন ভয়াবহ খুনী। কিন্তু কাউকেই তিনি বিশ্বাস করাতে পারেন নি যে, সেই খুনী নীলুকে স্পর্শ করতে পারে নি। কোনো-এক রহস্যময় কারণে তার মৃত্যু হয়েছিল। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে ডাক্তার অবশ্যি লিখেছিল--মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে মৃত্যু। কিন্তু জাহিদ সাহেব তা বিশ্বাস করেন না। তিনি জানেন মৃত্যুর কারণ অমীমাংসিত এবং রহস্যময়।

সেই রহস্য তাঁর মেয়েকে এখনো ঘিরে আছে। তিনি তা চান না। তিনি তাঁর মেয়ের জন্যে একটি সহজ স্বাভাবিক জীবন চান। একটি ছোট্ট সুখী সংসার। দুটি শিশু--তিনি যাদের হাত ধরে পার্কে বেড়াতে যাবেন। বাদাম কিনে দিবেন। এক জন হঠাৎ পড়ে গিয়ে ব্যথা পাবে। তিনি কোলে নিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করবেন। তাই দেখে অন্যজনের হিংসা হবে। তাকেও কোলে নিতে হবে। কেউ তখন আর কোল থেকে নামতে চাইবে না। বড় ঝামেলায় পড়ে যাবেন তিনি।

তাঁর চিন্তায় বাধা পড়ল। নীলু হেসে উঠল খিলখিল করে। পুরান দিনের নীলুর মতো। জাহিদ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'হাসছিস কেন?'

'তুমি কী অদ্ভুত সব কল্পনা কর বাবা!'

নীলু হাসতে হাসতে উঠে চলে গেল। জাহিদ সাহেব স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এ কোন নীলু? এই ভয়ঙ্কর ক্ষমতার উৎস কি?

৬

মিসির আলি হানিফাকে পিজিতে ভর্তি করিয়ে দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, মেয়েটি

একা–একা থাকতে ভয় পাবে। কিন্তু হানিফা ভয় পেল না।

'থাকতে পারবি তো?'

'হুঁ।'

'অনেক রকম পরীক্ষা–টরীক্ষা করবে ডাক্তাররা। ভয়ের কিছু নেই।'

'আমি ভয় পাই না।'

তিনি ভেবে দেখলেন, মেয়েটির ভয় না পাওয়ারই কথা। যে জীবন শুরু করেছে রাস্তায়, তার আবার ভয় কিসের?

'হানিফা।'

'জ্বি?'

'আমি দু'দিনের জন্যে ঢাকার বাইরে যাব। মোহনগঞ্জ যাব। তুই থাকতে পারবি তো?'

'পারব।'

'দু'দিন পরই এসে পড়ব। এর মধ্যে ডাক্তাররা পরীক্ষা–টরীক্ষা যা করবার করবেন। তাছাড়া আমি আমাদের বাড়িওয়ালাকে বলে যাব, তিনি খোঁজখবর করবেন।'

'খোঁজখবরের দরকার নাই।'

'দরকার থাকবে না কেন? দরকার আছে। যাই তাহলে, কেমন?'

'জ্বি আচ্ছা।'

মিশির আলি বিমর্ষ মুখে বের হয়ে এলেন। মেয়েটির অসুখ তাঁকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন ডাক্তারের পরামর্শে। ডাক্তারের ধারণা, হার্টসংক্রান্ত কোনো সমস্যা। ইসিজি টিসিজি করাতে হবে। হার্ট–বিট খুবই নাকি ইররেগুলার।

তাঁর ট্রেন রাত ন'টায়। তিনি ঠিক করলেন, রওনা হবার আগে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে যাবেন। পুলিশ কমিশনার সাজ্জাদ হোসেন তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধু। খুব–একটা পরিচয় তখন ছিল না। এখন হয়তো চিনতেই পারবে না। তবু পুরান পরিচয়ের সূত্র টানা যেতে পারে। গরজটা যখন তাঁর।

সাজ্জাদ হোসেন তাঁকে চিনলেন। শুধু যে চিনলেন তাই নয়, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। জড়িয়ে–টড়িয়ে ধরে একটা কাণ্ড করলেন। পুলিশের লোকদের মধ্যে এতটা আবেগ থাকে, তা মিসির আলি ভাবেন নি। তাঁর ধারণা ছিল, দিন রাত ক্রাইম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে এরা আবেগশূন্য হয়ে পড়ে। সেটাই স্বাভাবিক।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, 'ফ্যানটার নিচে আগে আরাম করে বস্, তারপর বল কী দরকারে এসেছিস। পুলিশের কাছে কেউ বিনা প্রয়োজনে আসে না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। পুলিশ এবং ডাক্তার––এই দু'ধরনের মানুষের কাছে কেউ বিনা প্রয়োজনে যায় না। এখন তুই বল, কী ব্যাপার? আত্মীয়স্বজন কাউকে পুলিশে ধরেছে?'

'না, সে সব কিছু না।'

'নে, সিগারেট নে। নিশ্চিন্তে খা। ঘুষের পয়সায় কেনা নয়। নিজের কষ্টে উপার্জিত রোজগার থেকে কেনা। হা হা হা।'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। সাজ্জাদ বললেন, 'বিয়ে-টিয়ে করেছিস?'

'না।'

'জানতাম করবি না। তুই হচ্ছিস একটা অড-বল। আমি বিয়ের পাট চুকিয়েছি আট বছর আগে। বাচ্চা-কাচ্চা কিছু হয় নি। হবেও না।'

সাজ্জাদ হোসেনের চোখে-মুখে ক্ষণিকের জন্য একটা ছায়া পড়ল। কিন্তু তিনি তা নিমিষেই কাটিয়ে উঠলেন। হাসি মুখে বললেন, 'জেসমিন চৌধুরী।'

মিসির আলি চিনতে পারলেন না। সাজ্জাদ হোসেন অবাক হয়ে বললেন, 'সত্যি চিনতে পারছিস না? ও তো টিভিতে অভিনয় করে। মারাত্মক! তাকে কেউ চেনে না, এটা তো আমি ভাবতেই পারি না।'

'টিভি নেই আমার বাসায়।'

'বলিস কি! বাসায় খাট-পালঙ্ক আছে তো? নাকি মেঝেতে পাটি পেতে ঘুমাস? হা হা হা। এখন বল তোর সমস্যা।'

'আমার একটি কাজের মেয়ে আছে--হানিফা।'

'জিসিনপত্র নিয়ে ভেগে গেছে?'

'না, তা না। আমি এই মেয়েটির অতীত ইতিহাস খুঁজে বের করতে চাই। সেটা কিভাবে করা সম্ভব, তাই জানার জন্যে তোর কাছে আসা।'

'পাস্ট হিস্ট্রি জানতে চাস কেন?'

'মেয়েটি জানে না, তার বাবা-মা কে। আত্মীয়স্বজন কে কোথায়, তাও বলতে পারে না। জ্ঞান হবার পর থেকেই সে দেখেছে যে, সে ভাসছে। আমি ওর বাবা-মাকে ট্রেস করতে চাই।'

সাজ্জাদ হোসেন গম্ভীর স্বরে বললেন, 'খামোখা চেষ্টা করছিস। কিছুই ট্রেস করা যাবে না। সম্ভবত জন্ম হয়েছে বেশ্যাপল্লীতে। তারপর হারিয়ে গেছে সেখান থেকে।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'কেন মনে হয় না?'

মিসির আলি তার জবাব না দিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় মেয়েটির শৈশব কেটেছে বিদেশে।'

'চোখ নীল? ব্লন্ড চুল?'

'না। মেয়েটি বাঙালিই, কিন্তু বাবা-মা হয়তো বিদেশে ছিলেন।'

'কেন বলছিস এ সব? তোর লজিক কি?'

মিসির আলি আরেকটা সিগারেট ধরালেন। এবং থেমে থেমে বললেন, 'হানিফা মেয়েটি গত পরশু রাতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রচন্ড জ্বর। জ্বরের ঘোরে সে বিড়বিড় করে বলছিল--'ইট হার্টস-ইট হার্টস।'

সাজ্জাদ হোসেন তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বলে চললেন, 'আমার

মনে হয়, খুব ছোটবেলায় মেয়েটি যখন অসুস্থ ছিল, তখন সে তার মাকে বলত–মামি ইট হার্টস। পরশু রাতে প্রচণ্ড জ্বরের মুখে অতীতের চাপা–পড়া কথাগুলো বের হয়ে এসেছে। অবচেতন মন সেই সময় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ জাতীয় ব্যাপারগুলো ঘটে।'

সাজ্জাদ হোসেন শুধু বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং!'

মিসির আলি বললেন, 'হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বাবা–মা নিশ্চয়ই থানায় ডায়েরি করান। সেখান থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না? ধর, আমি যদি জানতে চাই, পাঁচ থেকে আট বছর আগে কোন কোন বাচ্চা নিখোঁজ হয়েছিল–জানা যাবে কি?'

'না, এত পুরান রেকর্ডপত্র কে বের করবে বল? এটা তো ইংল্যাণ্ড আমেরিকা না যে, সব কম্পিউটারে ঢোকান আছে, বোতাম টিপলেই বেরিয়ে আসবে।'

'পুরান রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা নেই?'

'নতুন রেকর্ড রাখারই জায়গা নেই, আর পুরান রেকর্ড! একটা মিসিং পার্সন ব্যুরো আছে, সেখানে কোনো কাজ হয় না। তাছাড়া সেন্ট্রালি ইনফরমেশন রাখার কোনো ব্যবস্থা আছে বলে আমার মনে হয় না। প্রতিটি থানায়ও আলাদা আলাদা ভাবে খোঁজ করতে হবে। সেটা একটা বিশাল ব্যাপার।'

'বিশাল হলেও নিশ্চয়ই অসম্ভব না।'

'কিছুটা অসম্ভবও।'

'তোর পক্ষে কিছু করা সম্ভব না?'

সাজ্জাদ হোসেন গম্ভীর হয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, 'আমি নিজে সমস্ত পত্র–পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারি।'

'সেটা মন্দ না, গুড আইডিয়া।'

'না, আইডিয়াটা খুব গুড নয়।'

'নয় কেন?'

'অন্য এক সময় বলব, কেন নয়। আজ উঠতে হবে। ময়মনসিংহ যাচ্ছি একটা জরুরী কাজে। ফিরে এসে তোর সাথে যোগাযোগ করব।'

মিসির আলি উঠে পড়লেন।

৭

ফিরোজরা ধানমণ্ডির যে বাড়িটিতে থাকে, তাকে বাড়ি না বলে রাজপ্রাসাদ বলা যেতে পারে। বিশাল একটি দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারপাশে জেলের মত উঁচু পাঁচিল। গেটে বড় বড় করে লেখা 'কুকুর হইতে সাবধান।' গেটটি চব্বিশ ঘন্টাই বন্ধ থাকে। বন্ধ গেট ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ দারোয়ান এক জন আছে, যে প্রায় কখনোই গেটের কাছে থাকে না। আর থাকলেও ভান করে যে, কলিং বেলের শব্দ

শুনতে পায় নি।

পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই বিশাল বাড়িগুলো জনশূন্য হয়ে থাকে। এ বাড়িতেও তাই। তিনটি প্রাণী এ বাড়িতে বাস করে। ফিরোজ এবং তার বাবা ও মা। বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যে দশ জনের একটা বাহিনী আছে। তবে রাতে তারা এ বাড়িতে ঘুমায় না। বাড়ির পেছনেই হোস্টেল ঘরের মতো চার–পাঁচটা রুমের একটা টিনের হাফ–বিল্ডিং আছে। এরা রাতে সেখানে থাকে। মূল বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা হচ্ছে কলিং বেল। রাতের বেলায় প্রয়োজন হলে কলিং বেল টিপে এদের ডাকা হয়। সে প্রয়োজন সাধারণত হয় না।

ফিরোজের অসুখের পর অবস্থা খানিকটা বদলেছে। তার ঘরের সামনের বারান্দায় রহমতের শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কাদেরের মাকেও মূল বাড়ির একতলায় থাকতে দেয়া হয়েছে। তবে এ ব্যবস্থা সাময়িক।

ফিরোজের বাবা ওসমান সাহেবের বয়স প্রায় ষাট। ফিরোজ তাঁর তিন নম্বর ছেলে। ফিরোজের আগে দু'টি ছেলে যথাক্রমে ন'বছর এবং এগার বছর বয়সে মারা যায়। দু'টি মৃত্যুই অস্বাভাবিক। বড় ছেলে মারা যায় পিকনিক করতে গিয়ে। ইস্কুলের সব ছেলেরা দল বেঁধে গিয়েছিল সালনায়। পিকনিক শেষ করে সবাই ফিরে এল, কেউ লক্ষই করল একটি ছেলে কম। সালনার পুকুরে সে ভেসে উঠেছিল।

ওসমান সাহেবের মধ্যম ছেলেটি মারা গেছে রোড এ্যাক্সিডেন্টে। সে রাস্তা পার হবার সময় আচমকা দৌড় দেয় নি বা হঠাৎ কোনো ট্রাকের সামনে গিয়ে পড়ে নি। সে হাঁটছিল ফুটপাত ধরেই। কিন্তু সিমেন্টের বস্তা বোঝাই একটি ট্রাক সেই ছুটির দিনের সকালে ফুটপাতে উঠে গিয়েছিল।

যে পরিবারের দু'টি ছেলে অপঘাতে মারা যায়, সেই পরিবারের বাবা–মা সাধারণত ভেঙে পড়েন। এই পরিবারটির ক্ষেত্রে সে রকম কিছু ঘটে নি। ওসমান সাহেব অত্যন্ত শক্ত ধরনের মানুষ। কোনো কারণে বিচলিত হওয়া তাঁর স্বভাবের মধ্যেই নেই। তাঁর স্ত্রী ফরিদা স্বামীর এই গুণ কিছু পরিমাণে পেয়েছেন। বড় বড় ঝড়–ঝাপটাতে মোটমুটি স্থির থাকতে পারেন।

ফিরোজের ভয়াবহ বিপর্যয়েও তাঁরা স্বামী–স্ত্রী স্থির ছিলেন। ধৈর্য হারান নি। ফরিদা একবার শুধু বলেছিলেন, 'আমাদের ওপর কারোর অভিশাপ আছে।' আর তাতেই ওসমান সাহেব এমন ভঙ্গিতে তাকিয়েছিলেন যে, তিনি দ্বিতীয়বার এ জাতীয় কথা বলেন নি। স্বামীকে তিনি বেশ ভয় পান। তাঁর ইচ্ছা ছিল ফিরোজকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে নিয়ে যান। তাও সম্ভব হয় নি। ওসমান সাহেবের জন্যে। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমি আমার বদ্ধ উন্মাদ ছেলেকে বিদেশে নিয়ে যাব না। কিছুটা সুস্থ হোক, তারপর নিয়ে যাব।'

ফরিদা বলেছিলেন, 'চিকিৎসা যে করছে, সে তো ডাক্তার না। এক জন ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাও। ভদ্রলোক মাস্টার মানুষ, উনি কী চিকিৎসা করবেন?'

'যদি কেউ কিছু করতে পারে, উনিই পারবেন। ধৈর্য ধর।'

তিনি ধৈর্য ধরলেন। ধৈর্য ধরা বিফলে যায় নি। ফিরোজ এখন সুস্থ। ভয়াবহ একটা স্তর সে পার হয়েছে। ওসমান সাহেবের ধারণা, ফিরোজ এখন পুরোপুরি ভালো। সহজ–স্বাভাবিক মানুষ। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো পড়াশোনা শুরু করবে। এখন তাকে নিয়ে বাইরে যাওয়া যায়। পাহাড়ের ওপরে কোনো ঠাণ্ডা জায়গায়। হাতের কাছেই আছে নেপাল। প্লেনে যেতে তেতাল্লিশ মিনিট লাগে। ওসমান সাহেব ঠিক মনস্থির করতে পারছেন না। এখনো হয়তো ফিরোজকে নিয়ে বাইরে বেরুবার মতো অবস্থা হয় নি। মিসির আলি সে রকমই বলেছেন। মিসির আলির মতের সঙ্গে তিনি একমত নন। তবু তাঁকে অগ্রাহ্য করার সাহস হয় না। হয়তো আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণে বর্ষা শুরু হবে। তিনি শুনেছেন, বর্ষায় নেপাল দর্শনীয় নয়। দিনরাত টিপটিপ করে বৃষ্টি। হোটেলের ঘরেই বন্দী জীবন–যাপন করতে হবে।

ওসমান সাহেব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। এটা একটা নতুন ব্যাপার। তাঁর জীবনে ধৈর্যের অভাব কোনদিন ছিল না। তিনি সমস্ত জটিলতাকে সহজভাবে গ্রহণ করেন। এখন কি তা পারছেন না? ওসমান সাহেব চুরুট ধরিয়ে ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'ফরিদা , ফরিদা।'

ফরিদা পাশের ঘরেই ছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকলেন।

'ফিরোজ কেমন আছে আজ?'

'ভালো।'

'কি করছে?'

'ভেতরের বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছে।'

'শুধু শুধু বসে আছে?'

'না, কি যেন করছে। ডাকব?'

'ডাক।'

ফরিদা ডাকতে গেলেন। এবং ফিরে এলেন কাউকে না নিয়ে।

'ফিরোজ ঘুমাচ্ছে।'

'দুপুর এগারটায় কিসের ঘুম?'

ওসমান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। যদিও বিরক্ত হবার কোনোই কারণ নেই।

জুন মাসের দুপুরবেলায় কারো চোখে ঘুম জড়িয়ে আসাটা অন্যায় নয়। তাঁর নিজেরই ঘুমঘুম পাচ্ছে।

ফরিদা বললেন, 'তোমার কী হয়েছে? এমন রেগে কথা বলছ কেন?'

'রেগে রেগে কথা বলছি নাকি?'

'হুঁ। বেশ কয়েকদিন থেকেই লক্ষ করছি অল্পতেই ইউ আর লুজিং ইওর টেম্পার। তোমার ব্লাড প্রেসার কি বেড়েছে?'

'না।'

'চেক করিয়েছ?'

'না।'

'চেক না করিয়ে কীভাবে বলছ, বাড়ে নি? আমার তো মনে হয় বেড়েছে। শম্ভুবাবুকে ডাকি?'

'কাউকে ডাকতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কাজ কর।'

'আমার আবার কী কাজ যে করব?'

ওসমান সাহেব বুঝতে পারছেন, তাঁর মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছে। অসম্ভব খারাপ। এই মুহূর্তে তা চেক করা উচিত। রাগ সামলাবার কী-একটা পদ্ধতি যেন পড়েছিলেন বইয়ে। পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গোনা। কিন্তু তাঁর পায়ে জুতো। তিনি পায়ের নখের দিকে তাকাতে পারছেন না।

ফরিদা বললেন, 'তুমি এ রকম করছ কেন?'

'কি রকম করছি?'

'অস্বাভাবিক আচরণ করছ।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই। আজ দশটায় তোমার বোর্ড মীটিং ছিল। কোনো কারণ ছাড়াই তা ক্যানসেল করেছ। এবং--।'

'বল, কী বলতে চাও--থেমে গেলে কেন?'

'বেশ কিছুদিন থেকেই তুমি কোনো কাজকর্ম দেখছ না।'

'তাতে কিছুই আটকে নেই ফরিদা। আমি বিশ্রাম করছি। আমি ক্লান্ত। আমার মতো বয়সের একটি মানুষের ক্লান্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

ফরিদা ওসমান সাহেবের পাশের চেয়ারে বসলেন। চেয়ারের দু' হাতলে নিজের হাত তুলে দিলেন। বসার ভঙ্গি অনেকটা সিংহাসনে বসার মতো। ওসমান সাহেব তাঁর স্ত্রীর বসার এই ভঙ্গিটির সঙ্গে পরিচিত। এভাবে বসা মানেই, ফরিদা যুক্তি দিয়ে কিছু বলবে। সে যুক্তিগুলো কিছুতেই ফেলে দেয়া যাবে না। ওসমান সাহেব বললেন, 'বল, তুমি কী বলবে।'

ফরিদা সহজ কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললেন, 'গত তিন-চার দিন ধরে তুমি এ রকম আচরণ করছ এবং আমার মনে হয় ফিরোজের কোনো-একটা ব্যাপার তোমাকে এফেক্ট করেছে। সেটা কী?'

'কিছুই না। ফিরোজের কোনো ব্যাপার নয়। ফিরোজ এখন সুস্থ।'

'না, সে পুরোপুরি সুস্থ হয় নি।'

ফরিদার কণ্ঠ তীব্র ও তীক্ষ্ণ। ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। তিনি ভালো করেই জানেন, গত তিন দিন ধরে ফিরোজ খুবই অসুস্থ। তাঁর ধারণা, এই তথ্যটি তিনি একাই জানেন। এখন বুঝতে পারছেন, এ ধারণা সত্য নয়।

ফরিদাও সেটি জানে।

ওসমান সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমার জন্যে এক কাপ চা দিতে বল।'

ফরিদা উঠলেন না। তিনি জানেন, ওসমান সাহেবের চায়ের পিপাসা হয় নি।

আলোচনার মোড় ফেরাবার জন্যেই চায়ের প্রসঙ্গটা টেনে আনা। ওসমান সাহেব বললেন, 'আজ বোধ হয় বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি খুব দরকার।'

এই কথাটিও শুধু শুধু বলা। মেঘ-বৃষ্টি-রোদ নিয়ে ওসমান সাহেব কখনো মাথা ঘামান না, তাঁর এত সময় নেই।

'ফরিদা।'

'বল।'

'ফিরোজের বর্তমান অবস্থাটা তুমি জান?'

'জানি।'

'কখন জানলে?'

'চার দিন আগে।'

'আমাকে বল নি কেন?'

'তুমিও তো জানতে। তুমিও তো আমাকে কিছু বল নি।'

'বাড়ির অন্যরা জানে?'

'জানি না। অন্যরা জানে কিনা জিজ্ঞেস করি নি। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে নি।'

'মিসির আলি সাহেব জানেন? তাঁকে কিছু বলেছ?'

'না, আমি কিছু বলি নি।'

'আমার মনে হয় তাঁকে ব্যাপারটা জানান উচিত।'

'উচিত হলে জানাও।'

'আরো আগেই জানান উচিত ছিল। তাই না ফরিদা?'

ফরিদা কোনো জবাব না দিয়ে উঠে গেলেন। তাঁর মাথা ধরেছে। তিনি খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবেন। রোজ দুপুরবেলায় তাঁর মাথা ধরে। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকতে হয়।

ওসমান সাহেব বারান্দায় উঁকি দিলেন। ফিরোজ ইজিচেয়ারে ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুমাচ্ছে। নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। কে বলবে তার এত বড় সমস্যা আছে।

সমস্যাটি ওসমান সাহেব তিন দিন আগে প্রথম লক্ষ করেন। রাত ন'টার দিকে রোজকার রুটিন মতো তিনি ফিরোজের ঘরে ঢুকলেন। ফিরোজ হাসি মুখে বলল, 'কি খবর বাবা?'

'কোনো খবর নেই। এলাম খানিকক্ষণ গল্পগুজব করতে। বেড-টাইম গসিপিং।

'বোস।'

'কী করছিস?'

'কিছু করছি না। পড়ছি।'

'কী পড়ছিস?'

'গল্প উপন্যাস এইসব, সিরিয়াস কিছু নয়।'

'মাঝে মাঝে অবশ্যি গল্প-উপন্যাসও বেশ সিরিয়াস হয়।'

'তা হয়। তবে আমি পড়ি হালকা জিনিস। এখন পড়ছি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

নৌকাডুবি।'

'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস হালকা জিনিস! বলিস কি তুই?'

'বেচারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে বলেই যে তাঁকে ভারি ভারি উপন্যাস লিখতে হবে, তেমন তো কোনো কথা নেই।'

ফিরোজ হাসতে শুরু করল। সহজ স্বাভাবিক হাসি। এক জন অসুস্থ মানুষ এ রকম ভঙ্গিতে হাসতে পারে না। ওসমান সাহেব নিজেও হাসলেন এবং ঠিক তখনি একটা জিনিস লক্ষ করলেন।

ফিরোজের বিছানার ওপর প্রায় আড়াই হাত লম্বা একটা লোহার রড পড়ে আছে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'লোহার রডটা এখানে কেন?'

ফিরোজ তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

'কে রেখেছে এটা এখানে?'

'আমি।'

'কেন?'

'এমনি।'

'এমনি মানে? বিছানার ওপর কেউ লোহার রড রাখবে কেন? ব্যাপারটা কি?'

ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, ফিরোজের মুখ কেমন যেন কঠিন হয়ে আসছে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। জ্বলজ্বল করছে।

'দে আমার কাছে, বাইরে রেখে আসি।'

'না।'

'না মানে? এটা দিয়ে তুই কি করবি?'

ফিরোজ গম্ভীর গলায় বলল, 'বাবা তুমি এখন যাও, আমি ঘুমাব।'

'তুই ঘুমাবি, ভালো কথা, কিন্তু লোহার রড পাশে নিয়ে ঘুমাতে হবে কেন?'

'ঘুমালে অসুবিধা কি?'

'অসুবিধা কিছুই নেই। কিন্তু সবকিছুর একটা কারণ আছে। তুই কারণটা আমাকে বল।'

'না, বলব না।'

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ফিরোজের চোখ লাল হয়ে উঠছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ভারি ভারি নিঃশ্বাস ফেলছে। ওসমান সাহেবের মনে হল--'সামথিং ইজ রং। সামথিং ইজ ভেরি রং।'

'ফিরোজ।'

'জ্বি?'

'রড পাশে নিয়ে ঘুমানর কারণটা আমাকে বল। প্লীজ। তুই একটি বুদ্ধিমান ছেলে। কারণ নেই, এমন কিছু তোর পক্ষে করা সম্ভব নয়।'

ফিরোজ টেনে টেনে বলল, 'ও আমাকে রাখতে বলেছে।'

'কে রাখতে বলেছে?'

'ঐ লোক।'

'কোন লোক? তার নাম কি?'

'নাম জানি না।'

'লোকটা কে?'

'খালি গায়ের একটা লোক। কালো প্যান্ট পরা, চোখে চশমা। সোনালী ফ্রেমের চশমা।'

ওসমান সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। কার কথা বলছে সে?

ফিরোজ বলল, 'মিসির আলি স্যারকে ঐ লোকের কথা আমি বলেছি। উনি চেনেন।

'আই সি।'

'সে আমাকে বলেছে, লোহার রড সবসময় সঙ্গে রাখতে। যদি না রাখি, সে রাগ করবে।'

'এই ব্যাপারগুলো কি তুমি মিসির আলি সাহেবকে বলেছ?'

'জ্বি না।'

'বল নি কেন?'

'ঐ লোক আমাকে বলেছে এটা না বলতে।'

'আই সি।'

'বাবা, তুমি চলে যাও। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'মাত্র সাড়ে ন'টা বাজে। এখনিই ঘুম পাচ্ছে কি? আরেকটু বসি। গল্প করি তোর সঙ্গে।'

'গল্প করতে ইচ্ছা করছে না। তুমি এখন যাও।'

তিনি চলে এলেন, কিন্তু সারারাত তাঁর ঘুম হল না। তাঁর মনে হতে লাগল-- দরজায় একটা তালা লাগিয়ে রাখা উচিত, যাতে ফিরোজ কিছু বুঝতে না পারে। কিন্তু তালা লাগানর সাহস তাঁর হল না। তালা লাগানর ব্যাপারটা ফিরোজকে আরো এফেক্ট করবে। ভালোর চেয়ে মন্দ হবে বেশি।

ওসমান সাহেব ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকা ফিরোজের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী নিশ্চিন্তেই না ঘুমাচ্ছে সে। কে বলবে সে অসুস্থ। কত সহজ, কত স্বাভাবিক ঘুমাবার ভঙ্গি। কোলের ওপর একটা বই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের-- স্বপ্ন লজ্জাহীন। উপন্যাসটি কেমন কে জানে। সুনীলের কোনো বই পড়েন নি।

গল্প-উপন্যাস তাঁর পড়া হয়ে উঠে না।

ফিরোজ ঘুমের মধ্যেই নড়ে উঠল। ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে ডাকলেন, 'ফিরোজ।

ফিরোজ জবাব দিল না। তার পায়ের কাছে ভারি লোহার রডটি আছে। রডটি মাথা বেশ ধারাল। বারবার সেখানে চোখ আটকে যায়।

ওসমান সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাঁর বারবার মনে হচ্ছে, এই লোহার রডটি ভয়ঙ্কর কোনোকিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

মিসির আলির সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তিনি নাকি ঢাকায় নেই। কোথায়

গিয়েছেন কেউ বলতে পারে না। কবে ফিরবেন, তাও কারো জানা নেই।

৮

মোহনগঞ্জ স্টেশনে মিসির আলি নামলেন রাত সাড়ে সাতটায়। গায়ে প্রবল জ্বর। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। চোখ মেলতে পারছেন না, এ রকম অবস্থা। তাঁর নিজের বোকামির জন্যে এটা হয়েছে।

শ্যামগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেনে প্রচন্ড ভিড় ছিল। কামরায় লেখা 'পঁচিশ জন বসিবেন।'-- বসেছে পঞ্চাশ জন। আরো পঞ্চাশ জন দাঁড়িয়ে। অসম্ভব গরম। বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে আসছে উৎকট দুর্গন্ধ। বারবার মিসির আলির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। নরক-যন্ত্রণা বোধ হয় একেই বলে। যাত্রীদের মধ্যে এক জন রোগী আছে, যে কিছুক্ষণ পরপর গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। সেই শব্দ শুনে মনে হয়, এক্ষুণি বোধ হয় তার প্রাণবিয়োগ হবে। ভয়াবহ অবস্থা।

মিসির আলি শ্যামগঞ্জ নেমে পড়লেন। খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বুকভর্তি করে নিঃশ্বাস নেবেন, এ আশায়। ট্রেন ছাড়ার সময় হঠাৎ মনে হল--ছাদে বসে গেলে কেমন হয়? অনেকেই তো যাচ্ছে। বাতাসের অভাব হবে না সেখানে। গ্রামের ভেতর দিয়ে ট্রেন যাবে, টাটকা বাতাস পাওয়া যাবে। তিনি ছাদে উঠে পড়লেন।

ছাদের অবস্থা বেশ ভালো। চমৎকার হাওয়া। মিসির আলি নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন, ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্তটি নেবার জন্যে।

সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না। হিরণপুর আসবার আগেই আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। প্রবল বাতাস বইতে শুরু করল। ধরবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। তাঁর মনে হতে লাগল, যে-কোনো মুহূর্তে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে চষা খেতে ফেলবে। জীবনের ইতি হবে সেখানেই। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষণ। বৃষ্টির ফোঁটা সূঁচের মতো গায়ে বিঁধছে। আর কী ঠাণ্ডা! যেন বরফের চাই থেকে গলে গলে পড়ছে।

একটা ভালো অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার কথা অন্যকে বলার মতো সুযোগ কি আর হবে? মিসির আলি বাতাসের ঝাপ্টা সামলাবার চেষ্টা করছেন। ছাদের ওপরে বসা মানুষগুলোর কেউ কেউ আজান দিতে শুরু করেছে। আল্লাহ্‌কে খুশি করার একটা চেষ্টা। আল্লাহ্ খুশি হলেন কিনা বোঝা গেল না--ঝড়-বৃষ্টি কিছুই কমল না, তবে ড্রাইভার ট্রেন দাঁড় করিয়ে ফেলল। ছাদের ওপরে বসে-থাকা অসহায় মানুষগুলোর আজানের শব্দ নিশ্চয়ই তাঁর কানে গিয়েছে। আজানের ধ্বনি একেবারে বৃথা যায় নি।

ঝড় আধ ঘন্টার মতো স্থায়ী হল। এবং পরের কুড়ি মিনিটের মধ্যে মিসির আলির গায়ের তাপ হুহু করে বাড়তে লাগল। মোহনগঞ্জ স্টেশনে নেমে তাঁর মনে হল, প্লাটফরমেই শুয়ে পড়েন।

'স্যার, আপনি কি মিসির আলি?'

'হু।'

'আমি চৌধুরী বাড়ি থেকে আপনাকে নিতে এসেছি স্যার।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি কোন ট্রেনে আসবেন সেটা বলেন নাই, আমি সকাল থেকে সব ক'টা ট্রেন দেখছি।'

'খুব কষ্ট দিলাম–না?'

'জ্বি স্যার, তা দিলেন।'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। বেশ ছেলেটি। বুদ্ধিমান এবং স্মার্ট। কথাবার্তায় কোনো গ্রাম্য টান নেই।

'কি কর তুমি?'

'এখানকার কলেজে স্যার বি. এ. পড়ি। চৌধুরী বাড়িতে থাকি।'

'নাম কি তোমার?'

'জহুরুল হক।'

'জহুরুল হক সাহেব, চল রওনা হওয়া যাক।'

'চলুন। আপনার মালপত্র কোথায়?'

'মালপত্র কিছুই নেই। একটা হ্যাণ্ডব্যাগ ছিল, সেটা বাতাসে উড়ে গেছে।'

'বাতাসে উড়ে গেছে মানে?'

'ছাদে বসে এসেছি তো--ঝড়ের মধ্যে পড়েছি।'

'বলেন কী! কী সর্বনাশ!'

'শোন জহুরুল--এখান থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা কি? আমার কিন্তু হাঁটার ক্ষমতা নেই।'

'হাঁটা ছাড়া তো যাওয়ার অন্য কোনো ব্যবস্থাও নেই। নদীতে এখনো পানি হয় নি, নৌকা চলে না।'

মিসির আলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পথে নামলেন। সেখানে আবার তাঁকে বৃষ্টিতে ধরল।

তাঁর জ্বরের ঘোর কাটতে দু'দিন লাগল। পুরোপুরি আচ্ছন্ন অবস্থা গেল এ দু'দিন। সবকিছু স্বপ্নদৃশ্যের মতো। যা দেখেন, তাই মনে হয় কাটা কাটা খণ্ডচিত্র। একটির সঙ্গে অন্যটির মিল নেই।

একটি অপরূপা রূপবতী মেয়েকে প্রায়ই উদ্বিগ্ন মুখে তাঁর পাশে বসে থাকতে দেখেন। এই মেয়েটিই বোধ হয় নাজনীন। মেয়েটি মাথায় পানি ঢালে। মাথার চুল টেনে দেয় এবং অত্যন্ত নরম স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'চাচাজী, এখন কি একটু ভালো লাগছে? বলুন, ভালো লাগছে?'

তাঁর ভালো লাগে না। তবু মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলেন, 'ভালো লাগছে মা, বেশ ভালো লাগছে।'

এক জন বয়স্কা মহিলাকেও প্রায় সর্বক্ষণই তাঁর ঘরের চেয়ারে বসে থাকতে দেখেন। ইনি বোধ হয় নাজনীনের মা। এই মহিলাটি কথা–টথা বলেন না।

চব্বিশ ঘন্টা থাকবার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন, তাঁকে থাকতে হল এক সপ্তাহ। চার দিনের দিন তিনি নিজের ঘর থেকে বেরুলেন এবং খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আবার জ্বর বাঁধিয়ে ফেললেন। সেই জ্বর পুরোপুরি ছাড়ল না কখনো। তবু এর মধ্যেই যে–সব কাজ করবার কথা, সব করলেন।

প্রথম কাজ ছিল ফিরোজ এসে যে–সব জায়গায় গিয়েছে, সে–সব জায়গায় যাওয়া।

দেখা গেল, সে খুব বেশি বেড়ায় নি। বাড়ি এবং শিয়ালজানি খাল–এ দু'য়ের মধ্যেই তার গতিবিধি সীমিত ছিল। এক দিন শুধু 'উত্তর–বন্দ' বিলে গিয়েছিল মাছ ধরা দেখতে। সেখানে সে নিজেই নেমেছিল মাছ মারতে। তখন শিং মাছ কাঁটা ফুটিয়ে দেয়। সে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। তার ধারণা, সাপে কেটেছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। কারণ, ঘটনাটি ঘটে তার অসুস্থ হবার আগের দিন। খুব সম্ভব ঘটনাটি তার মনের ওপর ছাপ ফেলে। রাতে তার একটু জ্বরজ্বরও হয়।

যে বটগাছের নিচে চশমা–পরা লোকটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সেই গাছটিও তিনি দেখতে গেলেন। এবং গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হল, ঘটনাটি এখানে ঘটে নি। ফিরোজের বর্ণনা অনুসারে জায়গাটা নির্জন। দু'একটা পরিত্যক্ত হিন্দু ঘরবাড়ি ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু বটগাছটা যে–অঞ্চলে, সে জায়গাটা নির্জন নয়। পাশেই শিয়ালজানি খালের ওপর একটি বাঁশের সাঁকো, যার ওপর দিয়ে লোকজন চলাচল করছে। নদীর ওপারেই কয়েক ঘর কুমোরের বাস। তাদের বাড়ি ভর্তি ছেলেমেয়ে, যারা খুব হৈচৈ করে খেলে। এই অঞ্চলটিকে নির্জন বলা চলে না।

ঘটনাটি নিশ্চয়ই অন্য কোথাও ঘটেছে এবং ফিরোজ ঘোরের মধ্যে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছে বটগাছের নিচে, যেখানে অন্য লোকজন তাকে দেখতে পায়।

মিসির আলি শিয়ালজানি খালের দু'পার ধরে প্রচুর খোঁজাখুঁজি করলেন, কোনো বকুল গাছ পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গেল না।

তাঁর দ্বিতীয় কাজ ছিল এখানে আসার পর ফিরোজের সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছে, তাদের সঙ্গে আলাপ করা। জানতে চেষ্টা করা, তারা ফিরোজের আচার ব্যবহারে কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছে কিনা। দেখা গেল, খুব অল্পকিছু লোকজনের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। কেউ তেমন কিছু বলে নি। মিসির আলি প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ইন্টারভ্যুর খুঁটিনাটি লিখে ফেললেন। কয়েকটি নমুনাঃ

মোসাম্মাৎ সালেহা বেগম

বয়স ৫০/৫৫। আজমল চৌধুরীর মা। পর্দানশীন। কম কথা বলেন। রাতে চোখে ভালো দেখতে পান না।

প্রশ্ন : ফিরোজ ছেলেটি কেমন?

উত্তর : ভালো।

প্রশ্ন : কেমন ভালো?

উত্তর : এত বড় লোকের ছেলে, কিন্তু অহঙ্কার নাই।

প্রশ্ন : বুঝলেন কী করে অহঙ্কার নেই?

উত্তর : আমার পা ছুঁয়ে সালাম করল।

প্রশ্ন : যে দিন সে অসুস্থ হয় সেদিন, অর্থাৎ অসুস্থ হবার আগে কি তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

উত্তর : হয়েছিল, চা খাওয়ার সময়।

প্রশ্ন : কোনো কথা হয়েছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ওকে দেখে কি আপনার একটু অন্যরকম লাগছিল?

উত্তর : না। তবে চোখ–মুখ ফোলা ছিল। রাতে ঘুম হয় নি, সে জন্য বোধ হয়।

প্রশ্ন : বুঝলেন কী করে, ওর রাতে ঘুম হয় নি? কারণ আপনার সঙ্গে তো ওর কোনো কথা হয় নি।

উত্তর : সে আজমলের কাছে বলছিল, তাই শুনলাম।

প্রশ্ন : আপনি জিজ্ঞেস করেন নি, কী জন্যে ঘুম হয় নি?

উত্তর : না।

নাজনীন সুলতানা

বয়স ২০/২১ মমিনুন্নেসা কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে বাড়িতে আছে। অপরূপ রূপবতী। মায়ের মতো স্বল্পভাষী নয়। ইনহিবিশন কেটে গেলে প্রচুর কথা বলে। লাজুক নয়। কথাবার্তায় মনে হল অত্যন্ত জেদি, তবে হাসি খুশি ধরনের মেয়ে।

প্রশ্ন : কেমন আছ নাজনীন?

উত্তর : ভালো আছি চাচা, আপনি এমন খাতা–কলম নিয়ে প্রশ্ন করছেন কেন? আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি কোনো পত্রিকায় ইন্টারভ্যু দিচ্ছি।

প্রশ্ন : ফিরোজকে তোমার কেমন লেগেছিল?

উত্তর : ভালো।

প্রশ্ন : কেমন ভালো?

উত্তর : বেশ ভালো। (এই পর্যায়ে মেয়েটি ঈষৎ লজ্জা পেয়ে গেল।)

প্রশ্ন : ঠিক কী কারণে তুমি বলছ বেশ ভালো?

উত্তর : জানি না কী কারণে।

প্রশ্ন : ফিরোজ অসুস্থ হবার পেছনে কি কোনো কারণ আছে বলে মনে হয়?

উত্তর : এইসব নিয়ে আমি কখনো ভাবি নি চাচা।

প্রশ্ন : আচ্ছা, ফিরোজ অসুস্থ হয়ে তোমাদের বাড়িতে এল। সে সময় তুমি তার

সামনে গিয়েছিলে? তোমাকে কি সে চিনতে পেরেছিল?

উত্তর : চিনতে পেরেছিলেন কিনা, তা তো চাচা বলতে পারব না। তবে উনি খুব হৈচৈ করছিলেন, আমাকে দেখে হৈচৈ থামিয়ে ফেলেন। রাতের বেলাও খুব চিৎকার শুরু করলেন। তখন ভাইয়া আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমকে দেখে চুপ করে গেলেন।

প্রশ্ন : আচ্ছা এখন আমি একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি। জবাব দিতে না চাইলে জবাব দিও না। প্রশ্নটি হচ্ছে-- ধর, ফিরোজ যদি এখন পুরোপুরি সেরে যায় এবং তোমাকে বিয়ে করতে চায়, তুমি কি রাজি হবে?

উত্তর : খুব সহজ এবং শান্ত গলায়) হ্যাঁ হব। চাচা, আজকের মতো থাক। আপনার জন্যে এখন শরবত নিয়ে আসি--নাকি চা খাবেন? আপনি খুব ঘনঘন চা খাচ্ছেন--এটা কিন্তু চাচা ভালো না।

হরিপ্রসন্ন রায়
এম. বি. বি. এস.

স্থানীয় ডাক্তার। বয়স ৪০/৪৫। ব্যস্তবাগীশ লোক। এ অঞ্চলে তাঁর খুব পসার আছে। ইন্টারভ্যু চলাকালেই দু' জন লোক তাঁকে নিতে এল। কথা বেশি বলেন।

প্রশ্ন : আপনি কখন রুগীকে দেখতে এলেন?

উত্তর : আমাকে খবর পাঠিয়েছে পাঁচটায়। তখন যাওয়ার উপায় ছিল না। কারণ ধর্মপাশা থেকে এক জন পেসেন্ট এসেছে, এখন-তখন অবস্থা। পেটের ব্যথা। আলসার ছিল, সেই পেইন, কাজেই আমি সন্ধ্যার পরে গিয়ে উপস্থিত হই। ধরুন ছ'টা সাড়ে ছ'টা। শীতকাল তো ছ'টার সময় চারদিক অন্ধকার।

প্রশ্ন : আপনি কী দেখলেন? মানে রুগীর অবস্থার কথা বলছি।

উত্তর : গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। হিস্টিরিয়ার লক্ষণ মনে হল। চোখ বড় বড় করে ঘোরাচ্ছিল। ভয়াবহ অবস্থা। আমি নাড়ি দেখলাম। হার্টবিট ছিল খুব হাই। হিস্টিরিয়াতে এ রকম হয়।

প্রশ্ন : অষুধপত্র কী দিলেন?

উত্তর : তেমন কিছু না। ঘুমের অষুধ দিয়েছি, ফেনোবারবিটন। তারপর বললাম ইমিডিয়েটলি ঢাকা নিয়ে যেতে।

প্রশ্ন : কতক্ষণ ছিলেন আপনি?

উত্তর : রাত দশটা পর্যন্ত ছিলাম। ওরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। নাজনীন কান্নাকাটি করছিল। কাজেই রুগী ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ছিলাম।

প্রশ্ন : ঘুমের মধ্যে রুগী কি কোনো কথাবার্তা বলছিল?

উত্তর : না, সাউণ্ড ঘুম। আমি ঘুমের মধ্যে আরেকবার নাড়ি দেখলাম। হার্টবিট বেশি ছিল, তবে আগের চেয়ে কম। কত ছিল তা মনে নেই।

প্রশ্ন : গায়ে টেম্পারেচার ছিল?

উত্তর : আমি যখন দেখি, তখন অল্প ছিল। নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ। আমি চলে আসার সময় বলেছিলাম, সকালবেলা আবার দেখব। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় নি। ভোর পাঁচটার ট্রেনে রুগীকে নিয়ে তারা ঢাকা চলে যায়।

জহুরুল হক

বয়স ২০/২১। স্থানীয় কলেজের ছাত্র। বুদ্ধিমান এবং স্মার্ট। চৌধুরীদের বাড়ি লজিং থাকে। এদের সঙ্গে ক্ষীণ আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। কথাবার্তা শুনে ধারণা হল, নাজনীন মেয়েটির প্রতি সে খানিকটা অনুরক্ত।

প্রশ্ন : ফিরোজের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল?

উত্তর : জ্বি না। আমি একটু দূরে দূরে ছিলাম।

প্রশ্ন : দূরে দূরে ছিলে কেন?

উত্তর : আজমল ভাই সব সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। আমি আজমল ভাইকে সব সময় এড়িয়ে চলি। তাঁকে ভীষণ ভয় পাই। কাজেই……।

প্রশ্ন : ভয় পাও কেন?

উত্তর : আজমল ভাই ভীষণ রাগী। চট করে রেগে যায়। ওদের ফ্যামিলির সবাই খুব রাগী। এখনো ওদের মধ্যে কিছুটা জমিদার–জমিদার ভাব আছে। সবাইকে মনে করে ছোটলোক।

প্রশ্ন : ফিরোজ কেন অসুস্থ হয়েছিল বলে তোমার ধারণা?

উত্তর : জানি না কেন হয়েছে। তবে লোকে বলে, ওরা ধুতুরার বীজ খাইয়ে পাগল করে ফেলেছে।

প্রশ্ন : বল কি তুমি!

উত্তর: না, আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। লোকে কী বলে, সেটা বললাম।

প্রশ্ন : লোকে এ জাতীয় কথা কেন বলছে?

উত্তর : এদের পূর্বপুরষরা খুব অত্যাচারী জমিদার ছিল। এরা মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ করে দিয়েছিল। এরা প্রচুর অন্যায় করেছে, সেই জন্যেই এ সব বলে।

প্রশ্ন : তুমি মনে হয় এদের ওপর রেগে আছ?

উত্তর : না, রাগব কেন? সত্যি কথাটা আপনাকে বলালাম।

মোহনগঞ্জে আসায় মিসির আলি সাহেবের তেমন কোনো লাভ হয় নি। এখন পর্যন্ত এমন কোনো তথ্য পান নি, যেটা তাঁর কোনো কাজে আসবে। চট করে অবশ্যি কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। খুঁজতে হয়। জট খোলবার প্রথম ধাপই হচ্ছে অনুসন্ধান। অন্ধকারে হাতড়ানর মতো কোনো আলো'র ইশারা থাকতে হবে। সে–রকম কোনো আলোর সন্ধান মিসির আলি এখনো পান নি।

তবে যাবার দিন ভোরবেলায় একটি সূত্র পাওয়া গেল। অস্বস্তিকর একটি সূত্র,

যাকে গ্রহণ করাও যায় না, আবার ফেলে দেয়াও যায় না। নাজনীন এসে বলল, 'চাচা, আসুন আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাব।'

'কী মজার জিনিস?

'আমাদের এক পূর্বপুরুষ পিতলের একটা কলসি পেয়েছিলেন। কলসি ভর্তি ছিল মোহর। সেই মোহর পেয়েই তারা জমিদার হল।'

'কলসিটায় কোনো বিশেষত্ব আছে?'

'না। সাধারণ কলসি, তবে অমাবশ্যার সময়ে এটা ঝনঝন শব্দ করে।'

'তুমি নিজে শুনেছ?'

'না, তবে অনেকেই শুনেছে। আমি আর ভাইয়া এক অমাবশ্যার রাতে কলসির পাশে জেগে ছিলাম। কিচ্ছু শুনতে পাই নি।'

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, 'প্রাচীন মোহর ভর্তি কলসি--এ জাতীয় গল্প খুব প্রচলিত। তবে এ সবের কোনো ভিত্তি নেই।'

'চাচা, অনেকেই কিন্তু শব্দ শুনেছে।'

'হয়তো ইঁদুর ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। ইঁদুর শব্দ করেছে।'

মিসির আলি কলসি দেখার জন্যে কোনোরকম আগ্রহ বোধ করলেন না। শুধুমাত্র নাজনীনের মন রক্ষার জন্যে সঙ্গে গেলেন। দোতলার উত্তরের সবচেয়ে শেষের ঘরটির তালা খুলল নাজনীন। মিসির আলির শিরদাঁড়া দিয়ে একটি ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। কলসির কারণে নয়। এ ঘরে কয়েকটি পুরান পেইনটিং আছে। তাদের একটিতে খালি গায়ে একটি লোক ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। তার পরনে কালো রঙের প্যান্ট। চোখে সোনালি চশমা। শুকনো ধরনের কঠিন একটি মুখ।

'নাজনীন, এ ছবিটা কার?'

'আমার দাদার বাবা। উনি খালি গায়ে ঘোড়ায় চড়তেন।'

'নাম কি ওঁর?'

'মাসুক চৌধুরী।'

'ওঁর সম্পর্কে আর কি জান তুমি?'

'বিশেষ কিছু জানি না। শুনেছি, খুব অত্যাচারী ছিলেন। তারপর এক দিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন। হঠাৎ প্রজারা তাঁকে ঘিরে ফেলে।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি? মেরে ফেলে। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মারে।--চাচা এই দেখুন কলসি। আবার কি কি যেন লেখাও আছে গায়ে। চেষ্টা করে দেখুন, পড়তে পারেন কিনা। পালি ভাষায় লেখা।'

লেখা পড়ার ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করলেন না। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তোমার দাদার বাবাকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মারে?'

'হ্যাঁ। ওঁর কথা এত জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা, ফিরোজ কি এই ঘরটি দেখেছে? সে কি এই ঘরে

ঢুকেছিল?'

'জ্বি না।'

'কী করে বুঝলে ঢোকে নি?'

'কারণ, ঘরটা তালা দেয়া থাকে। এই তালার একটিমাত্র চাবি। সেই চাবি থাকে আমার কাছে।'

'জানালা–টানালা দিয়ে এই ঘরে ঢোকার কোনো উপায় নেই, তাই না?'

'উঁহু, আর উপায় থাকলেই শুধু শুধু জানালা দিয়ে ঢুকতে যাবেন কেন? কী আছে এই ঘরে?'

মিসির আলি দাঁড়িয়ে রইলেন ছবির সামনে। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। তিনি জট খুলতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু জট খুলছে না। আরো পাকিয়ে যাচ্ছে। ফিরোজ যদি একবার এই ঘরে ঢুকত, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই অনেক সহজ হয়ে যেত। তিনি বলতে পারতেন––ফিরোজ এই ছবিটি দেখেছে। তার মনে ছাপ ফেলেছে এই ছবি। পরবর্তী সময়ে ছবির মানুষটিকেই সে দেখেছে। হেলুসিনেশন। কত সহজ সমাধান।

কিন্তু ফিরোজ এই ছবি দেখে নি।

মিসির আলি বললেন, 'একটি মাত্র চাবি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি নিশ্চিত যে এই ঘরের দ্বিতীয় কোনো চাবি নেই?'

'হ্যা, নিশ্চিত।'

মিসির আলি আবার তাকালেন ছবির দিকে। তার কেন জানি মনে হল, ছবির মানুষটি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। বিদ্রুপের হাসি। তাচ্ছিল্যের হাসি।

৯

নীলু পত্রিকার খবরটা চারবার পড়ল।

একটা লাল কলম দিয়ে বক্স করা খবরটির প্রতিটি লাইন দাগাল, তারপর কাগজটা তার বাবাকে দিয়ে এল। খবরটা এ রকম–

পুরানা পল্টনে আতঙ্ক

(স্টাফ রিপোর্টার)

শুক্রবার রাত একটার দিকে পুরানা পল্টন এলাকায় মধ্যযুগীয় নাটকের অবতারণা হয়েছে। লোহার রড হাতে এক যুবক অত্র অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য অনুযায়ী উক্ত যুবকটির পরনে ছিল কালো প্যান্ট। গায়ে কোনো কাপড় ছিল না। সে প্রথমে

একটা রাস্তার কুকুর পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং তার পরপরই গাড়ি বারান্দায় শুয়ে থাকা কিছু ছিন্নমূল মানুষকে আক্রমণ করে। সৌভাগ্যবশত কেউ হতাহত হয় নি। চিৎকার এবং হৈচৈ শুনে প্রচুর লোকজন জমে যায় এবং যুবকটি পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। নীলক্ষেত পুলিশ-ফাঁড়ির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। ফাঁড়ি কর্তৃপক্ষ জানান যে, এই প্রসঙ্গে তাঁরা কিছুই জানেন না।

জাহিদ সাহেব খবরটা পড়লেন। কিন্তু তাঁর কোনো ভাবান্তর হল না। পত্রিকা খুললেই এ জাতীয় খবর থাকে। বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ ত্রাসের সৃষ্টি করছে। একবার খবর বেরুল, ছোট ছোট শিশুদের পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। একবার বেরুল, রক্তচোষার আগমন ঘটেছে। এরা কাউকে একা পেলেই ধরে বেঁধে সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে সমস্ত রক্ত নিয়ে যাচ্ছে। খলিলুল্লাহ্ বলে এক লোককে নিয়ে প্রচুর হৈচৈ হল। এই লোকটির প্রধান খাদ্য নাকি মৃত মানুষের কলিজা। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কতটুকু সত্যি কে জানে!

জাহিদ সাহেবের ধারণা, এ জাতীয় খবরের বেশির ভাগই রিপোর্টাররা চা-সিগারেট খেতে খেতে তৈরি করেন। মানুষের কৌতূহল জাগিয়ে পত্রিকার কাটতি বাড়ান। এ জাতীয় খবরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, বেশ কয়েকটি ফলো আপ স্টোরি ছাপা হবে এবং স`বশেষে একটি সচিত্র ফিচারের মাধ্যমে ঘটনার ইতি হবে। অতঃপর রিপোর্টাররা অন্য কোনো ভয়াবহ ঘটনা ফাঁদতে চেষ্টা করবেন-'অজ্ঞাতনামা জন্তু' বা এই জাতীয় কিছু।

কিন্তু নীলু এই খবরটি এভাবে দাগিয়েছে কেন? বর্তমানে নীলুর কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। সে কি সেই ক্ষমতার কারণেই কিছু আঁচ করছে?

দুপুরবেলা খাবার সময় জাহদি সাহেব প্রসঙ্গটা তুললেন। হালকা গলায় বললেন, 'পুরানা পল্টনে আতঙ্ক, এই খবরটা তুই দাগিয়েছিস কেন?'

নীলু জবাব দিল না। তার মুখ থমথমে। জাহিদ সাহেব বুঝলেন, নীলু এখন কোনো কথারই জবাব দেবে না। মাঝে মাঝে সে এ রকম চুপ করে যায়। প্রয়োজনীয় কথাটাও বলে না।

জাহিদ সাহেব মেয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিজের মনে বললেন, 'দরজা-টরজা ভালোমতো বন্ধ করে ঘুমান উচিত। বলা তো যায় না। পল্টন আর কাঁঠালবাগান-- খুব একটা দূরের ব্যাপার না।'

তাঁর এ সব বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মেয়েকে আলোচনায় টেনে আনা। কিন্তু নীলু একটি কথাও বলল না। খাওয়ার মাঝখানেই সে উঠে চলে গেল।

জাহিদ সাহেব যা ভেবেছিলেন, তাই। ফলো-আপ স্টোরি ছাপা হয়েছে। খবর চলে

এসেছে প্রথম পাতায়। আকর্ষণীয় শিরোনাম।

নগ্নগাত্র বিভীষিকা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পহেলা জুলাই শনিবার, পুরানা পল্টন এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী যুবক আবার আজ গভীর রাতে দেখা দিয়েছে। যথারীতি তার হাতে ছিল লোহার রড। এবার তার রডের আঘাতে রাহেলা নাম্নী এক পতিতা গুরুতর আহত হয়। তার ডান হাত এবং পাঁজরের দুটি হাড় ভেঙে যায়। তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাহেলার বর্ণনা অনুযায়ী রাত আনুমানিক দুই ঘটিকার সময় নগ্নগাত্র যুবক একটি সুঁচাল লোহার রড নিয়ে উপস্থিত হয় এবং---।

নীলু আজও খবরটির চারদিকে লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দিল। তারপর বাবাকে খবরের কাগজটি দিয়ে বলল, 'বাবা, আমাকে একটা কাজ করে দেবে?'

'নিশ্চয়ই দেব। কাজটা কী?'

'আমি মিসির আলি স্যারকে চিঠি লিখেছি। ঐটি তাঁকে পৌঁছে দেবে। তিনি অবশ্যি এখনো ঢাকায় ফেরেন নি। তুমি দরজার নিচ দিয়ে রেখে আসবে, যাতে আসামাত্র পেয়ে যান।'

জাহিদ সাহেব বিস্মিত হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। নীলু বলল, 'স্যারের খুব বিপদ। খালি গায়ে ছেলেটি স্যারকে মেরে ফেলবে। তাঁকে সাবধান করা দরকার।'

'বলিস কি!'

'আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি। তুমি এক্ষুণি যাও। খামের ওপর ঠিকানা লেখা আছে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু আমার ভালো লাগছে না।'

জাহিদ সাহেব দেখলেন, খামের ওপর পুরানা পল্টনের ঠিকানা লেখা।

১০

পুলিশ কমিশনার রাত এগারটায় পুরানা পল্টন এলাকায় এলেন। থমথম করছে চারদিক। একটি ভিখিরিকেও দেখা গেল না। দোকান-পাট পর্যন্ত বন্ধ। তিনি লক্ষ করলেন, একতলার বাসিন্দাদের প্রায় সবাই এই প্রচণ্ড গরমেও জানালা বন্ধ করে শুয়েছে। আতঙ্কের মতো ভয়াবহ কিছুই নেই। এবং পুলিশের শাস্ত্রে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের মতো ভয়াবহ কিছুই নেই। মিছিলের মানুষজন হঠাৎ ক্ষিপ্তের মতো পুলিশের গাড়িতে

ঝাঁপিয়ে পড়ে, কারণ রাইফেল হাতে পুলিশকে দেখে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়।

সাজ্জাদ হোসেন গাড়ি থেকে নেমে সিগারেট ধরালেন। এ অঞ্চলে টহলপুলিশের সংখ্যা বাড়ান হয়েছে। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন তাদের জন্যে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলবেন। হঠাৎ করেই তাঁর মনে হল, গোরস্থানের ভেতর কিছু ফিক্সড পোস্ট সেন্ট্রি দেয়া দরকার। লুকিয়ে থাকার জন্যে গোরস্থান হচ্ছে আদর্শ জায়গা। কেউ কিচ্ছু টের পাবে না। একসময় আত্মগোপনকারী দেয়াল টপকে ঝাঁপিয়ে পড়বে অসতর্ক পথচারীর ওপর।

তিন জন পুলিশের একটি দল আসছে গল্প করতে করতে। সাজ্জাদ হোসেন লক্ষ করলেন, এদের সঙ্গে টর্চ লাইট নেই। অথচ বলে দেয়া হয়েছিল, পাঁচ ব্যাটারির একটি টর্চ লাইট যেন সঙ্গে থাকে। পুলিশ বাহিনীতে একটি কাজও কি কখনো ঠিকমতো করা হবে না!

'হল্ট।'

তিন জন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং স্যালুট দিল।

'তোমরা তিন জন কেন? একেকটা দলে দু' জন করে থাকতে বলেছি। তৃতীয় জন এসে জুটল কিভাবে?'

জানা গেল, এই ব্যবস্থা তারা নিজেরা করে নিয়েছে। তিন জন থাকলে নাকি মনে বেশি সাহস থাকে।

'তোমরা কি লোহার রড হাতে একটা লোকের ভয়ে আধমরা হয়ে গেছ? এক জন আনসারের সাহসও তো তোমাদের চেয়ে বেশি।'

ওরা কিছু বলল না। তিনি থমথমে গলায় বললেন, 'মেইন রোড ধরে হাঁটছ কেন? আমি বলেছি না, অলি–গলিতে থাকবে এবং কিছুক্ষণ পরপর বাঁশি বাজাবে? আমি পনের মিনিট এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, একবারও তো তোমাদের বাঁশি শুনলাম না।'

'বাঁশি শুনলে তো স্যার ঐ ব্যাটা সাবধান হয়ে যাবে। ধরতে পারব না।'

'ঐ ব্যাটার জন্যে আমার মোটেও মাথাব্যথা নেই। বাঁশি বাজান দরকার অন্যদের সাহস দেবার জন্যে। যাতে সবাই বুঝতে পারে, ভালো পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। বুঝতে পারছ?'

'জ্বি স্যার।'

'আর শোন, রাত একটার পর যাকেই দেখবে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। খালি গায়েই হোক কিংবা কোট–প্যান্ট পরাই হোক। বুঝতে পারছ?'

'জ্বি স্যার।'

সাজ্জাদ হোসেন গোরস্থানে ঢুকলেন। সন্দেহজনক কিছুই কোথাও নেই। টুপি পরা দু'–তিন জন লোক ঘোরাফেরা করছে। এরা গোরস্থানেরই লোক। তবু তিনি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ওদের এক জন হাসি মুখে বলল, 'গোরস্থানে কোনো আজেবাজে লোক ঢোকে না স্যার। গোরস্থান হইল গিয়া আল্লাহ্ পাকের খাস জায়গা।'

সাজ্জাদ হোসেন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তাকে থামালেন। তাঁর আঠার বছরের পুলিশী

জীবনে তিনি ভয়ঙ্কর সব অপরাধীদের গোরস্থান এবং মসজিদে লুকিয়ে থাকতে দেখেছেন।

'তোমরা সজাগ থাকবে এবং লক্ষ রাখবে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'কাল থেকে গোরস্থানের ভেতরেও আমি পুলিশ বসাব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'যতো শুয়োরের বাচ্চা।'

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। পুলিশ সাহেব গালটা কাকে দিলেন, বোঝা গেল না। এই লোকের মেজাজ খারাপ। গোরস্থানের ভেতর কেউ এ রকম গরম দেখায় না। এত সাহস কারো নেই।

সাজ্জাদ হোসেন তাঁর জীপ নিয়ে আরো খানিকক্ষণ এই অঞ্চলে ঘুরলেন। একটা পাগল–ছাগল রড হাতে বের হয়েছে এবং সেই কারণে এ জাতীয় পুলিশী তৎপরতার কোনো মানে হয় না। কিন্তু এটা করতে হয়েছে, কারণ এক জন মন্ত্রীর শ্বশুরবাড়ি এই অঞ্চলে। এমনিতেই মন্ত্রীদের যন্ত্রণায় প্রাণ বের হয়ে যায়, তার ওপর ইনি হচ্ছেন নন পার্লামেন্টারিয়ান মন্ত্রী। এঁদের গরমই আলাদা।

তিনি মন্ত্রী সাহেবের শ্বশুরবাড়ির সামনে জীপ থামালেন। বাড়ির সামনেই পুলিশ পাহারা আছে। সব ক'জন মন্ত্রীর শ্বশুরবাড়ির সামনে পুলিস পাহারার ব্যবস্থা করতে হলে তো সর্বনাশ। বিশাল এক পুলিশ বাহিনী লাগবে মন্ত্রীদের আত্মীয়–স্বজনদের জন্যে।

সাজ্জাদ হোসেনের মুখ তেতো হয়ে গেল। তিনি শব্দ করে থুথু ফেললেন। মিসির আলির বাড়িও এ অঞ্চলে। ঠিকানা সঙ্গে নেই। ঠিকানা থাকলে একবার যাওয়া যেত। মিসির আলির কাজের মেয়েটি সম্পর্কেও তিনি কিছু খোঁজখবর নিয়েছেন। হারিয়ে যাওয়া বেশকিছু মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলো দিয়ে মিসির আলিকে আপাতত ঠাণ্ডা করা যাবে।

সেন্ট্রি এগিয়ে আসছে।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, 'কী খবর?'

'খবর স্যার ভালোই।'

'সব ঠিকঠাক?'

'জ্বি স্যার। তবে স্যার, এই বাড়ির লোকজন আমার সাথে খুব রাগারাগি করছে।'

'কেন?'

'এরা নাকি দু' জন সেন্ট্রি চেয়েছিল। এক জন দেখে রেগে গেছে।'

'দু' জন লাগবে কেন? এরা কোন দেশের মহারাজ?'

'স্যার কী বললেন?'

'কিছু বলি নি। যাও, ডিউটি দাও।'

'এরা স্যার জিজ্ঞেস করছিল, তোমাদের ডিউটি অফিসার কে।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার। বলছিল, ব্যাটার চাকরি খাব।'

সাজ্জাদ হোসেন আবার থুথু ফেললেন। মন্ত্রীদের আত্মীয়–স্বজনেরা কথায় কথায় চাকরি খেতে চায়। চাকরি ছাড়া ওদের মুখে অন্য কিছু রোচে না। শালা!

'সেন্ট্রি।'

'জ্বি স্যার?'

'যাও ডিউটি কর। দেখি, আমি আরেক জনকে পাঠাব।'

সাজ্জাদ হোসেন মনে মনে ভাবলেন, 'পুলিশের চাকরি করার মানেই হচ্ছে পদে–পদে অপমানিত ও অপদস্থ হওয়া।

১১

মিসির আলি ঢাকা পৌঁছলেন রবিবার ভোরে। দরজা খুলেই নীলুর চিঠি ভর্তি খাম পেলেন। চিঠিতে একটিমাত্র লাইন–'স্যার, আপনার বড় বিপদ!' কিসের বিপদ–কী সমাচার, কিছুই লেখা নেই।

মেয়েদের নিয়ে এই সমস্যা। তাদের সব চিঠিতেই অপ্রয়োজনীয় কথার ছড়াছড়ি। শুধু প্রয়োজনীয় কথাগুলোর বেলায় তারা শর্টহ্যাণ্ড ভাষা ব্যবহার করে। আজ পর্যন্ত তিনি মেয়েদের এমন কোনো চিঠি পান নি, যেখানে জরুরী কথাগুলো গুছিয়ে লেখা।

তবে নীলু একটি কাজ করেছে। নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে। এক্ষুণি চলে যাওয়া যায়। মিসির আলি গেলেন না। হাত–মুখ ধুয়ে প্ল্যান করতে বসলেন, আজ সারাদিনে কী কী করবেন।

(ক) হানিফার খোঁজ নেবেন।

(খ) ইউনিভার্সিটিতে যাবেন।

(গ) ফিরোজের খোঁজ নেবেন।

(ঘ) সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করবেন।

(ঙ) আজমলের সঙ্গে দেখা করবেন।

এই পাঁচটি কাজ শেষ করবার পর নীলুর কাছে যাওয়া যেতে পারে। তাঁর এমন কোনো বিপদ নেই যে এক্ষুণি ছুটে যেতে হবে। তবে কেন জানি নীলুর কাছে আগে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ফ্রয়েডীয়ান কোনো ব্যাখ্যা এর নিশ্চয়ই আছে।

ট্রেনে আসতে আসতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এবং আশ্চর্য, নীলুকে স্বপ্নে দেখলেন। স্বপ্নটি এমন ছিল, যে, জেগে উঠে তাঁর নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল, তাঁর পাশে বসে থাকা লোকগুলোও তাঁর স্বপ্নের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। তিনি যে খানিকক্ষণ আগেই একটি রূপবতী মেয়ের হাত ধরে নদীর ধারে হাঁটছিলেন, এটা সবাই জানে।

হানিফা সুস্থ।

তবে অনেক রোগা হয়ে গেছে। মুখ শুকিয়ে হয়েছে এতটুকু। হানিফার কাছে তিনি ঠিক সময়েই এসেছেন। আজই তার রিলিজ অর্ডার হবে। আর এক দিন দেরি হলে মুশকিল হয়ে যেত। মেয়েটি ঘাবড়ে যেত। কারণ এই সাত দিন কেউ তাকে দেখতে আসে নি। অথচ বাড়িওয়ালা করিম সাহেব বারবার বলেছেন, তিনি প্রতিদিন একবার এসে খোঁজ নেবেন। আমাদের দেশের মানুষদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, যে কাজগুলো তারা করতে পারবে না, সেই কাজগুলোর দায়িত্ব তারা সবচেয়ে আগ্রহ করে নেবে।

'চল হানিফা, বাসায় যাই।'

'চলেন।'

'তুই তো দারুণ রোগা হয়েছিস রে বেটি।'

'আপনেও রোগা হইছেন।'

'অসুখে পড়ে গিয়েছিলাম রে হানিফা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল নিউমোনিয়াতে ধরেছে। মরতে-মরতে বেঁচে গেছি। তুই বস এখানে, আমি রিলিজ অর্ডারের ব্যবস্থা করি।'

রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান বললেন, 'হানিফা মেয়েটি আপাতত সুস্থ, কিন্তু আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

'কেন?'

'ওর প্রবলেমটা হার্টের একটা ভাল্বে। তার জন্মই হয়েছিল একটা ডিফেকটিভ ভাল্ব নিয়ে। তার ছোটবেলায় ডাক্তাররা চেষ্টা করেছেন ভাল্বটা রিপেয়ার করতে। ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে তার।'

'কী করে বুঝলেন? মেয়েটি বলেছে?'

'না, সে কিছু বলে নি। জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার কিছু মনে-টনে নেই। তবে আমাদের বুঝতে না পারার কোনো কারণ নেই। ওর হার্ট আবার ওপেন করতে হবে।

'এখানে করা যাবে?'

'আগে যেখানে করা হয়েছিল, সেখানে করলেই ভাল হয়। আমাদের এখানে এত ছোট বাচ্চাদের ওপেন হার্ট সার্জারির সুযোগ নেই।'

'আপনার ধারণা, ওর অপারেশনটা এ দেশে হয় নি।?'

'না, এ দেশে হয় নি। পশ্চিমা কোনো দেশে হয়েছে। কেন, আপনি জানেন না?'

'জ্বি না, আমার জানা নেই।'

মিসির আলি চিন্তিত মুখে হানিফাকে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। সে কতদূর কি করেছে জানা দরকার, বা আদৌ কিছু করেছে কিনা। কিছু না করারই কথা। এ দেশের বেশির ভাগ লোকই কোনো কাজ করতে চায় না। 'কেন করতে চায় না'--এই নিয়ে কিছু ভালো গবেষণা হওয়া দরকার। কর্মবিমুখতার কারণটি কী? যদি একাধিক কারণ থেকে থাকে, সেগুলোই-বা কী?

সাজ্জাদ হোসেনকে টেলিফোনে পাওয়া গেল না। যতবারই টেলিফোন করা হয়, ততবারই খুব চিকন গলায় এক জন পুরুষ মানুষ বলেন, 'উনি ব্যস্ত আছেন। মিটিং চলছে।'

মিসির আলি বড় বিরক্ত হলেন। পুলিশরা এত মিটিং করে, তাঁর জানা ছিল না। ঘন্টার পর ঘন্টা এয়ার কন্ডিশনড ঘরে বসে মিটিং করার মতো সময় তো তাদের থাকার কথা নয়। এগুলো হচ্ছে করপোরেট অফিসগুলোর কাজ--শুধু কথা বলা, বকবক করা। কিছুক্ষণ পরপর কফি খাওয়া। সুখে সময় কাটান যার নাম।

সাজ্জাদ হোসেনের সময়টা অবশ্যি খুব সুখে কাটছিল না। মন্ত্রীর শাশুড়ির কল্যাণে তিনি একটি বিপজ্জনক অবস্থায় আছেন। আই জি মতিয়ুর রহমান পি এস পি'র কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে।

আই জি মতিয়ুর রহমান ছোটখাট মানুষ, কিন্তু দারুণ কড়া অফিসার। পুলিশমহলে একটি চালু কথা আছে--মতিয়ুর রহমানের সামনে দাঁড়ালে হাতিরও বুক কাঁপে। সাজ্জাদ হোসেনের বুক কাঁপছিল।

মতিয়ুর রহমান বললেন, 'দু' জন সেন্ট্রি চেয়েছিল, দিতেন দু' জন, কেন ঝামেলা করলেন?'

'আমি স্যার দিতাম, পরে অফিসে ফিরে মনে হল খামোখা ····।'

'এক জন মন্ত্রীর শাশুড়ির ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেক বড় ব্যাপার, কেন বুঝতে পারেন না? তাছাড়া যে এক জন সেন্ট্রি ছিল, সকালবেলা দেখা গেল সে ঘুমাচ্ছে।'

'সারা রাত ডিউটি দিয়েছে স্যার, কাজেই ভোরবেলা ঘুম এসে গেছে। পুলিস হলেও তো স্যার এরা মানুষ।'

'এখন বলেন, আমি কী করি। মিনিস্টার সাহেব ভোর সাতটায় আমাকে টেলিফোন করে বলেছেন, আপনার বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেবার জন্যে।'

সাজ্জাদ হোসেন ক্লান্ত গলায় বললেন, 'কি আর করবেন স্যার। অ্যাকশান নিতে বলেছে, অ্যাকশান নেন।'

মতিয়ুর রহমান সাহেব ফাইল থেকে একটি চিঠি বের করে বললেন, 'আমি মিনিস্টার সাহেবকে এই চিঠিটা পাঠিয়েছি। কি লিখেছি শুনুন-'

জনাব,

পুলিশ কমিশনার সাজ্জাদ হোসেনের বিরুদ্ধে আপনি আমাকে যে অ্যাকশান নেবার কথা বলেছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে জানাচ্ছি যে সাজ্জাদ হোসেন পুলিশ বাহিনীর এক জন দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং সৎ অফিসার। একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্যে তাকে বীর বিক্রম উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছে। এ জাতীয় এক জন অফিসারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে লিখিত অভিযোগের প্রয়োজন আছে। আপনার অভিযোগের উপর ভিত্তি করে তদন্ত হবে। তদন্তকারী অফিসার সাজ্জাদ হোসেনকে দোষী সাব্যস্ত করবার পরই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে।

বিনীত

মতিয়ুর রহমান চিঠি পড়া শেষ করে বললেন, 'ঠিক আছে?'

'থ্যাংক য়ু ভেরি মাচ স্যার।'

'থ্যাংকস দেবার কিছু নেই। সত্যি কথাই লিখেছি। তবে, আপনার উচিত আরো ট্যাক্টফুল হওয়া।'

'যাব স্যার?'

'হ্যাঁ যান।'

'স্যার একটা কথা বলি?'

'বলুন।'

'স্যার, আমার ইচ্ছা হচ্ছে কালো একটা প্যান্ট পরে খালি গায়ে হাতে একটা লোহার রড নিয়ে যাই এবং ঐ শাশুড়ির মাথায় একটা বাড়ি দিয়ে আসি।'

কথাটা বলেই সাজ্জাদ হোসেনের মনে হল, একটা বড় ভুল হয়ে গেল। আই জি এমন কোনো ব্যক্তি নন, যিনি রসিকতা সহজভাবে নেবেন। কিন্তু অবাক কান্ড, মতিয়ুর রহমান সাহেব হেসে ফেললেন। মুচকি হাসি নয়। হা হা করে হাসি।

সাজ্জাদ হোসেনের জীবনে এটা একটা স্মরণীয় দিন। তাঁর মনের গ্লানি কেটে যেতে শুরু করেছে। তিনি অফিসে ফিরে দুটি সংবাদ শুনলেন-—দশ মিনিট পরপর কে নাকি তাঁকে খোঁজ করছে এবং গত রাতে নগ্নগাত্র ত্রাস একটি ছ' বছরের ছেলেকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। তার ডেডবডি কিছুক্ষণ আগেই রিকভার করা হয়েছে। চেনার উপায় নেই। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে থেঁতলে ফেলা হয়েছে।

সাজ্জাদ হোসেন তক্ষুণি জীপ নিয়ে বেরুলেন।

'হ্যালো, এটা কি ফিরোজদের বাসা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কে কথা বলছেন?'

'আপনি কে এবং আপনার কাকে দরকার, সেটা বলুন।'

'আমার নাম মিসির আলি'

'ও আচ্ছা। আমি ফিরোজের মা।'

'স্লামালিকুম আপা।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আমি সপ্তাহখানেক বাইরে ছিলাম। আপনাদের খবর দিয়ে যেতে পারি নি।'

'ও।'

'গিয়েছিলাম চব্বিশ ঘন্টার জন্যে, ঝামেলায় পড়ে এত দেরি হল। আমি ফিরোজের ব্যাপারেই খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।'

'ও।'

'ফিরোজ কেমন আছে?'

'ভালো।'

'ওকে টেলিফোনটা দিন।'

'ওকে টেলিফোন দেয়া যাবে না।'

'বাসায় নেই।'

'না।'

'কোথায় গিয়েছে? বাইরে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি বরং রাতের বেলা একবার টেলিফোন করব।'

'না, রাতের বেলা টেলিফোন করবেন না। ওকে পাওয়া যাবে না।'

'কেন, ও কি রাতে ফিরবে না?'

'না। ও ঢাকার বাইরে।'

'ঢাকার বাইরে–কোথায়?'

'ওর মামার বাড়িতে–বরিশালে।'

'কিন্তু আমি তো বলেছিলাম ওকে দীর্ঘদিন চোখে–চোখে রাখতে হবে।'

কোনো উত্তর নেই।

'হ্যালো।'

'বলুন।'

'কী হয়েছে ফিরোজের?'

'কী আবার হবে? কিছুই হয় নি। ও ভালো আছে।'

'কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, কিছু–একটা হয়েছে। আপনি কি দয়া করে বলবেন?'

'ওর কিছু হয় নি। ও ভালো আছে। ও আছে তার মামার বাড়িতে।'

'বরিশালে?'

'হ্যাঁ, বরিশালে।'

'আপনি ঠিক কথা বলছেন না। কারণ ফিরোজের মামার বাড়ি বরিশাল নয়। ফিরোজ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আমার জানা। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, কী হয়েছে।'

'কিছু হয় নি। অনেকবার তো এই কথা বললাম। তবু কেন বিরক্ত করছেন?'

'ওসমান সাহেবকে দিন। তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'উনি বাসায় নেই।'

'কখন ফিরবেন?'

'জানি না কখন ফিরবেন।'

'শুনুন আপা, আমি আসছি এই মুহূর্তে।'

মিসির আলি টেলিফোন নামিয়ে রেখে তক্ষুণি ধানমণ্ডি ছুটলেন। কিন্তু ওসমান সাহেবের বাড়ির ভেতর ঢুকতে পারলেন না। দারোয়ান গেট বন্ধ করে বসে আছে। সে কিছুতেই গেট খুলবে না। ওসমান সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী–কেউ নাকি বাড়ি নেই। কখন

ফিরবেন তারও ঠিক নেই। মিসির আলি বললেন, 'ঠিক আছে, আমি বসার ঘরে অপেক্ষা করব। গেট খোল।'

'সাহেব আর মেমসাহেব বাড়িতে না থাকলে গেট খোলা নিষেধ আছে।

মিসির আলি প্রায় দু' ঘন্টা বন্ধ গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনো লাভ হল না। নীলুদের বাসা কাছেই কোথাও হবে। ঝিকাতলা ধানমণ্ডি থেকে খুব-একটা দূর নয়। মিসির আলি সেদিকেই রওনা হলেন।

ফিরোজের কথা বারবার মনে আসছে। কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছেন না। কী হল ছেলেটার? আর যদি কিছু হয়েই থাকে, সবাই মিলে এটা তাঁর কাছে গোপন করছে কেন? রহস্যটা কী? রাতে ফেরবার পথে আরেকবার খোঁজ নিতে হবে।

১২

মিসির আলি নরম স্বরে বললেন, 'আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন অধ্যাপক। আমার এক ছাত্রী কি এ বাড়িতে---।'

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, 'আসুন, আমি নীলুর বাবা। আমার নাম জাহিদুল ইসলাম।'

'স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। বসুন আপনি, নীলু এসে পড়বে।'

'ওকে খবর দিন। আমি বেশিক্ষণ থাকব না, আকাশের অবস্থা ভালো না-ঝড়-বৃষ্টি হবে।'

জাহিদ সাহেব তাঁর মেয়েকে খবর দেয়ার জন্যে মোটেই ব্যস্ত হলেন না। খবর দেয়ার কিছু নেই। নীলু খবর পেয়ে গেছে। দশ মিনিট আগেই সে বলেছে, 'স্যার আমাদের বাসার দিকে রওনা হয়েছেন। এসে পড়বেন কিছুক্ষণের মধ্যে।'

নীলুর মুখ উজ্জ্বল এবং হাসি হাসি। এই সব জাহিদ সাহেবের ভালো লাগছে না। এক জন মাঝবয়সী অধ্যাপকের জন্যে এত আগ্রহ নিয়ে তাঁর মেয়ে অপেক্ষা করবে কেন?

তিনি একটি সুস্থ স্বাভাবিক মেয়েকে নিজের পাশে চান--যার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। কী হবে না হবে, যা সে আগে থেকে বলতে পারবে না। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে যে গ্রহণ করবে আর দশটি মেয়ের মতো।

মিসির আলি বললেন, 'আমি আপনার এ বাড়িতে আগে একবার এসেছি। আনিস সাহেব বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর স্ত্রীকে কিছুদিন চিকিৎসা করেছিলাম।'

'আমি জানি।'

'আনিস সাহেব কি এখনো এ বাড়িতে থাকেন?'

'না।'

'অন্য কোনো ভাড়াটে এসেছে বুঝি?'

'না, বাড়ি ভাড়া দিই না এখন, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।'

'এ কথা বলছেন কেন?'

'রানু মেয়েটা এ বাড়িতে না থাকলে, আজ আমার মেয়ের এ অবস্থা হত না।

'এত জোর দিয়ে তা বলা কি ঠিক? অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা আমরা কেউ তো জানি না।'

জাহিদ সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। রোগা, কালো এবং কিঞ্চিৎ কুঁজো হয়ে বসে থাকা এই লোকটিকে তাঁর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। নীলু এই লোকটির মধ্যে কী দেখেছে? জাহিদ সাহেবের ইচ্ছা হচ্ছে উঠে চলে যেতে। কিন্তু বাইরের একটি লোককে একা বসিয়ে রেখে উঠে চলে যাওয়া যায় না। তিনি লক্ষ করলেন, ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়েছেন। তাঁর সামনেই অ্যাশট্রে তবু তিনি চারদিকে ছাই ফেলছেন। কী কুৎসিত স্বভাব! এরা ছাত্রদের কী শেখাবে? নিজেরাই তো কিছু শেখে নি।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার আরেকটি মেয়ে ছিল। ওর কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছে সে?'

'বাইরে।'

বিলুর প্রসঙ্গ উঠলেই জাহিদ সাহেব অনেক কথা বলেন। কিন্তু আজ এই লোকটির সঙ্গে কোনো কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি?'

'আমার মাথা ধরেছে, আমি একটু শুয়ে থাকব। কিছু মনে করবেন না। আমি নীলুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

জাহিদ সাহেব নীলুর ঘরে উঁকি দিয়ে অবাক এবং দুঃখিত হলেন। নীলু শাড়ি বদল করেছে। সাধারণ শাড়ি বদলে বেগুনি রঙের চমৎকার একটি শাড়ি পরেছে এবং চুল বাঁধছে। এর মানেটা কী?

'নীলু।'

'জ্বি?'

'তোর স্যার বসে আছেন নিচে।'

'যাচ্ছি বাবা।'

'বেশিক্ষণ ওঁকে আটকে রাখা ঠিক না। আকাশের অবস্থা খারাপ।'

'বাবা, আমি তো ওঁকে আজ রাতে এখানে থেকে যেতে বলব।'

'সে কি! কেন?'

'আমার কথা শেষ হতে অনেক রাত হয়ে যাবে। এত রাতে আমি ওঁকে ছাড়ব না।'

'কথাটা তাহলে দিনের বেলা বল। কাল ওঁকে আসতে বলে দে।'

'বাবা, ওঁর সঙ্গে আজই আমার কথা বলা দরকার। একটা রাত উনি এখানে থাকলে, তোমার কি কোনা আপত্তি আছে?'

জাহিদ সাহেব হ্যাঁ, না--কিছুই বলতে পারলেন না। নীলু বলল, 'আমাদের গেস্টরুমটা ঠিকঠাক করে রেখেছি। উনি সেখানেই থাকবেন। তুমি এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন বাবা? আপত্তি থাকলে বল--আমার আপত্তি আছে।'

'আমার আপত্তি আছে।'

'আপত্তিটা কেন?'

'ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে তোর এত কিসের খাতির?'

'খাতির কিছু নেই বাবা। উনি আমার টিচার এবং চমৎকার এক জন টিচার। আমি অনেক কিছু শিখেছি তাঁর কাছ থেকে। তাঁর প্রতি আমার অন্য রকম একটা শ্রদ্ধা আছে।'

'এই জন্যেই কি এত শাড়ি-গয়না পরে সাজতে শুরু করেছিস?'

'না বাবা, সে জন্যে সাজছি না এবং তুমি যা ভাবছ তাও ঠিক না। আমি এত সাজগোজ করছি, কারণ স্যার রিকশা করে আসতে আসতে ভাবছিলেন, আমাকে দেখবেন বেগুনি রঙের একটা শাড়ি পরা অবস্থায়। কাজেই আমি এইভাবে সেজেছি। রহস্যময় সবকিছুতে স্যারের অবিশ্বাস আছে, আমি সেটা দূর করতে চাই। চলে যেও না বাবা, আমার কথা এখনো শেষ হয় নি। এই স্যার রানু আপার ব্যাপারটা খুব ভালো জানেন। রানু আপার রহস্যের সঙ্গে আমার রহস্যের একটা মিল আছে। সেই মিল নিয়ে স্যারের সঙ্গে আমি কথা বলব।

নীলু দম নেয়ার জন্যে থামল। জাহিদ সাহেব কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

'বাবা।'

'বল।'

'স্যার যদি আজ রাতে এ বাড়ির গেস্টরুমে থাকেন, তোমার কি খুব বেশি আপত্তি হবে?'

'না।'

'আমি যখন স্যারের সঙ্গে কথা বলব, তখন তুমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে থাকতে পার।'

'না, আমি শুয়ে থাকব, আমার মাথা ধরেছে।'

'না বাবা, তোমার মাথা ধরে নি। তুমি আমার স্যারকে খুবই অপছন্দ করছ বলে এ রকম করছ। বাবা, তোমাকে শুধু একটা কথা বলি--মানুষ হিসেবে উনি প্রথম শ্রেণীর। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই না?'

'বিশ্বাস করব না কেন? করছি।'

'না, তুমি করছ না। তাতে অবশ্যি কিছু যায় আসে না, তবে তুমি যদি বিশ্বাস করতে, তাহলে আমার ভালো লাগত। ঠিক আছে বাবা, তুমি যাও, শুয়ে থাক। রাত দশটার সময় টেবিলে ভাত দেব, তখন তোমাকে ডাকব।'

নীলু বসার ঘরে ঢুকল নিঃশব্দে। মিসির আলি চাঁপা ফুলের হালকা একটা সুবাস পেয়ে চমকে পেছনে ফিরলেন। নীলু বলল, 'কেমন আছেন স্যার?'

তিনি কোনো জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর দারুণ অস্বস্তি ও লজ্জা লাগতে লাগল। একটা বিব্রতকর অবস্থা। কারণ তিনি রিকশায় আসতে আসতে নীলুকে যেভাবে দেখবেন কল্পনা করেছিলেন, সে ঠিক সেভাবেই সেজেছে। কাকতালীয় মিল বলে একে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। দুটি কারণে এ রকম হতে পারে। হয়তো নীলু এ রকম সেজে বসে ছিল। তিনি তাঁর ই এস পি-র মাধ্যমে তা টের পেয়েছেন। এটা সম্ভব নয়, কারণ মিসির আলি খুব ভালো করেই জানেন, তাঁর কোনো ESPক্ষমতা নেই। দ্বিতীয় কারণটি যদি সত্যি হয়, তাহলে বড় অস্বস্তির ব্যাপার হবে। তিনি রিকশায় আসতে আসতে যা ভাবছিলেন, নীলু তা টের পেয়েছে এবং সেইভাবে সেজেছে। এ রকম হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

মিসির আলি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন! তাঁর মনে নীলু সম্পর্কে যে-সব কল্পনা আছে, তা তিনি আড়াল করে রাখতে চান। বিশেষ করে ট্রেনে আসতে আসতে যে স্বপ্নটা দেখেছেন। এটি যদি নীলু টের পায়, তাহলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, 'দেখ নীলু, স্বপ্নের ওপর আমার হাত নেই। স্বপ্ন হচ্ছে স্বপ্ন।'

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের এক জন শিক্ষক হিসেবে তিনি জানেন, স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়। অবচেতন কামনা-বাসনার ছবি। তিনি তাকালেন নীলুর দিকে। মেয়েটির মুখে হাসি। ছোটদের দুষ্টুমি দেখে বড়রা যে রকম হাসে, সে রকম।

নীলু বলল, 'স্যার চলুন, আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি।'

'আমি বেশিক্ষণ বসব না নীলু। আকাশের অবস্থা ভালো না। ঝড় হবে।'

'হলে হবে। ঝড়-বৃষ্টি নিয়ে ঠিক এই মুহূর্তে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

বারান্দায় অন্ধকার। সেখানে পাশাপাশি দুটি বেতের চেয়ার দেয়া আছে। গ্রিল থাকা সত্ত্বেও বারান্দায় বসে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। যে আকাশে অনবরত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মিসির আলি বললেন, 'কী বলবে তুমি, বল।'

নীলু বলল, 'আপনি একবার ক্লাসে ESP-র ওপর বলেছিলেন। আপনার মনে আছে?'

'আছে।'

'আমার এবং আমার কয়েকজন বন্ধুর ESPআছে কিনা তা পরীক্ষা করলেন। মনে আছে।'

'হ্যাঁ, মনে আছে। 'জেনার কার্ড' দিয়ে পরীক্ষা।'

'সেই পরীক্ষায় আমরা কেউ পাস করতে পারি নি। তার মানে, আমাদের কারোরই এক্সট্রা সেনসরী পারসেপশান ক্ষমতা নেই।'

'হুঁ, তা ঠিক। যাদের লজিক খুব তীক্ষ্ণ, তাদের এটা থাকে না। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের, যাদের লজিক খুব দুর্বল--তাদের থাকে।'

'স্যার, আমি জানি না আমি এখন একটি নিম্নশ্রেণীর প্রাণী কিনা, কিন্তু আমার ESP ক্ষমতা অনেক বেশি। ঠিক এই মুহূর্তে আপনি কী ভাবছেন, আমি বলে দিতে পারি।'

নীলু বলতে বলতে হেসে ফেলল। এবং হাসি ঢাকার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। মিসির আলি খুব লজ্জায় পড়ে গেলেন। কারণ, তিনি একটি আপত্তিকর ভাবনা ভাবছিলেন। তিনি ভাবছিলেন--নীলুর সঙ্গে রিকশা করে যাচ্ছেন। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে দু' জনেই ভিজে জবজবে। হুড তোলা এবং পর্দা ফেলা। রিকশাওয়ালা বাতাস কাটিয়ে বহু কষ্টে এগুচ্ছে। তিনি নীলুর হাত ধরে আছেন।

'স্যার।'

'বল।'

'শুধু শুধু আপনি এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আমরা সবাই তো এরকম কত অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা করি, এবং এটাই তো স্বাভাবিক।'

'হুঁ, তা ঠিক। আমার সঙ্গে কী বলতে চাচ্ছিলে বল। আমি বেশিক্ষণ থাকব না। ঝড় আসবে।'

বলতে না বলতেই বড় বড় ফোটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বাতাস বইতে শুরু করল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকারে ডুবে গেল। নীলু মৃদু স্বরে বলল, 'রানু আপাকে তো আপনি ভালো মতোন চিনতেন, তাই না স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'রানু আপার সঙ্গে আমার কী কী মিল আছে?'

'কোনো মিল নেই। প্রতিটি মানুষই আলাদা। এক জন মানুষের সঙ্গে অন্য এক জন মানুষের মিল থাকে সামান্যই।'

'কিন্তু রানু আপার অসম্ভব ইএসপি ক্ষমতা ছিল। ছিল না।'

'তা ছিল।'

'আমারও আছে। আছে না?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'রানু আপা কি আপনাকে কখনো বলেছিল, তার ভেতরে এক জন দেবী বাস করেন?'

'বলেছিল।'

'আপনি বিশ্বাস করেন নি?'

'না, করি নি। এই সব ছেলেমানুষী জিনিস বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে।'

'স্যার, রানু আপা যা বলত, এখন আমি যদি তা-ই বলি--আপনি বিশ্বাস করবেন না?'

'না।'

'পৃথিবীতে অনেক রহস্যময় ব্যাপার আছে স্যার।'

'একসময় ঝড়-বৃষ্টিকেও রহস্যময় মনে করা হত, এখন করা হয় না। মানুষের জ্ঞান, মানুষের বুদ্ধি রহস্যময়তাকে সরিয়ে দিচ্ছে। এই পৃথিবীতে যত অলৌকিক ব্যাপার আছে, তার প্রতিটির পেছনে আছে একটি লৌকিক ব্যাখ্যা।'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন এবং বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন--

'দেখ নীলু, তুমি বলছ তোমার ভেতর এক জন দেবী আছেন। সেই দেবী যদি এই মুহূর্তে তোমার ভেতর থেকে বের হয়ে আসেন এবং আমাকে বলেন 'এই যে মিসির আলি সাহেব।' তাহলেও আমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করব না। আমি খুঁজব একটা লৌকিক ব্যাখ্যা।'

'কী হবে সেই ব্যাখ্যা?'

'আমি যা দেখব, মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় তার নাম হেলুসিনেশন। কিছু কিছু ড্রাগ্‌স্ আছে, যা খেলে হেলুসিনেশন হয়। যেমন এলএসডি। ইংল্যাণ্ডে আমি এক ছাত্রকে দেখেছিলাম--সে এলএসডি খেত যিশু খ্রিস্টকে দেখার জন্যে। এলএসডি খেলেই সে যিশু খ্রিস্টকে দেখতে পেত। তুমি বুঝতেই পারছ, সে যা দেখত, তা হেলুসিনেশন।

নীলু দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে রইল। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। এক-একটা বাতাসের ঝাপটা এসে গা ভিজিয়ে দিচ্ছে, তবু দু' জনের কেউ নড়ল না। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। শুধু মিসির আলির সিগারেটের আলো ওঠানামা করছে।

'নীলু ক্ষীণ স্বরে বলল, 'স্যার।'

'বল।'

'আমি একটি খারাপ লোকের হাতে পড়েছিলাম স্যার। একটা ভয়ঙ্কর খারাপ লোক আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নির্জন একটা ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। সে একটা ক্ষুর নিয়ে এসেছিল আমাকে মারতে। তখন সেই দেবী আমাকে রক্ষা করেন। সমস্ত ব্যাপারটা আমার দেখা। দেবীকেও আমি দেখেছি। একটি অপূর্ব নারীমূর্তি।

'তুমি বলতে চাও, তারপর থেকে সেই দেবী তোমার সঙ্গে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি যা দেখেছ, তার যে একটা লৌকিক ব্যাখ্যা হতে পারে--তা কি তুমি ভেবেছ?'

'সবকিছুর ব্যাখ্যা নেই স্যার।'

'চেষ্টা করে দেখি, এর একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করান যায় কিনা।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করুন।'

'রানু মেয়েটির সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল। তার কাছ থেকেই দেবীর ব্যাপারটি তুমি শুনেছ। একটা নতুন ধরনের কথা। রোমান্টিক ফ্লেভার আছে দেবীর ব্যাপারটায়, কাজেই জিনিসটা তোমার মনে গেঁথে রইল। তুমি নিজে যখন বিপদে পড়লে, ঐ জিনিসটাই উঠে এল তোমার মনের ভেতর থেকে। একটা হেলুসিনেশন হল। তীব্র মানসিক চাপ এবং তীব্র হতাশা থেকে এই হেলুসিনেশনের জন্ম। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে stress induced hallucination.

'ঐ খারাপ লোকটি মারা গেল কিভাবে?'

'তার মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক কারণে। পা পিছলে উল্টে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে বা এই জাতীয় কিছু। এখানে দেবীর কোনো ভূমিকা নেই। লোকটির সুরতহাল রিপোর্ট থেকেই তার মৃত্যুর কারণ বের হয়ে আসা উচিত। কী ছিল পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে?'

মিসির আলি প্রশ্নের জবাবের জন্যে অপেক্ষা করলেন। কোনো জবাব পাওয়া গেল না। নীলু মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। অন্ধকারে পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কেন জানি তাঁর মনে হল, মেয়েটি কাঁদছে। কাঁদবে কেন সে? কাঁদার মতো কোনো কথা কি তিনি বলেছেন?

'নীলু।'

'জ্বি।'

'আমি এখন উঠি? আমার যাওয়া দরকার। এ বৃষ্টি কমবে না। যত রাত হবে, তত বাড়বে। তুমি কি আমাকে আরো কিছু বলবে?'

নীলু জবাব দিল না। মিসির উঠে দাঁড়ালেন।

'তোমার বাবাকে খবর দাও, বিদেয় নিয়ে যাই।'

নীলু কঠিন কণ্ঠে বলল, 'আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'বাসায় যাচ্ছি, আর কোথায় যাব?'

'না আপনার বাসায় যাওয়া হবে না। আজ রাতে আপনি এখানে থাকবেন।'

'কী বলছ তুমি!'

'আপনার জন্যে ঘর রেডি করে রেখেছি। সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম আছে। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এখানে কেন থাকব?'

'এখানে থাকবেন, কারণ আজ রাতে লোহার রড নিয়ে একটি ছেলে আপনাকে মারতে যাবে। আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না বা বানিয়েও কিছু বলছি না। আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি। ঐ ছেলেটির নাম যদি আপনি জানতে চান, তাও বলতে পারি। কি, জানতে চান?'

মিসির আলি ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'ওর কী নাম?'

'ওর নাম ফিরোজ। স্যার, আপনি কি আমি যা বলছি, তা বিশ্বাস করছেন?'

'বুঝতে পারছি না। আমি একটি দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছি।'

'দ্বিধার মধ্যে পড়েন বা না পড়েন--আমি এখান থেকে আপনাকে যেতে দেব না, কিছুতেই না।'

মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটি কঠিন স্বরে কথা বলছে। তার কথা বলার ধরন থেকেই বলে দেয়া যায়, এই মেয়ে তাকে যেতে দেবে না।

'নীলু, আমার বাসায় কাজের মেয়েটি আছে একা।'

'না 'ইমা' আপনার ঘরে নেই। আপনার ফিরতে দেরি দেখে সে বাড়িওয়ালার ঘরে

ঘুমতে গেছে।'

'তুমি ওর কী নাম বললে?'

'যা নাম, তা-ই বললাম--ইমা!'

'ইমা?'

'হ্যাঁ, ইমা।'

'ওর বাবার নাম বলতে পারবে?'

'ইমা নাম থেকেই আপনি ওর বাবাকে বের করতে পারবেন।'

বলতে বলতে নীলু হেসে উঠল। হাসিতে একটি ধাতব ঝংকার। অন্য এক ধরনের কাঠিন্য। যেন এ নীলু নয়, অন্য একটি মেয়ে। অচেনা এক জন মেয়ে।

'স্যার আসুন, আপনাকে আপনার ঘর দেখিয়ে দিই। ড্রয়ারে মোমবাতি আছে, মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে বসে বৃষ্টির শোভা দেখুন। আমি যাব রান্না করতে।'

'তোমাদের টেলিফোন আছে না?'

'আছে। দিয়ে যাচ্ছি আপনার ঘরে। যত ইচ্ছা টেলিফোন করুন।'

টেলিফোনে অনেক চেষ্টা করেও ফিরোজদের বাড়ির কাউকে ধরা গেল না। হয় টেলিফোন নষ্ট কিংবা রিং হচ্ছে, কেউ ধরছে না। আশ্চর্য ব্যাপার!

বাড়িওয়ালা করিম সাহেবকে টেলিফোন করলেন। করিম সাহেব জেগে ছিলেন এবং তিনি জানালেন হানিফা তাঁর বাসাতেই আছে। ঘুমচ্ছে।

মিসির আলি মোমবাতি জ্বালিয়ে গেস্ট রুমে বসে রইলেন একা-একা। এখনো ইলেকট্রিসিটি আসে নি। বাজ পড়ে কোনো ট্রান্সফরমার পুড়ে-টুড়ে গেছে হয়তো। কেউ ঠিক করবার চেষ্টা করছে না। এ দেশে কেউ কোনো কিছু ঠিক করবার জন্যে ব্যস্ত নয়। শহর অন্ধকারে ডুবে আছে তো কী হয়েছে? থাকুক ডুবে। দুষ্ট লোকেরা অন্ধকারে বেরিয়ে আসবে? আসুক বেরিয়ে। আমরা কেউ কারো জন্যে কোনো মমতা দেখাব না। মমতা এ যুগের জিনিস নয়।

কিন্তু সত্যি কি নয়? মমতা কি কেউ কেউ দেখাচ্ছে না? নীলু যে তাঁকে আটকে রাখল, তার পেছনে কি মমতা কাজ করছে না?

সে কেন তাঁকে এই মমতাটা দেখাচ্ছে? কেন, কেন? তাঁর ভুরু কুঞ্চিত হল। কপালের শিরা দপদপ করতে লাগল। জ্বর আসছে নাকি?

তিনি আবার সিগারেট ধরালেন। প্যাকেট শূন্য হয়ে আসছে। রাত কাটবে কী করে? এ বাড়িতে এখনও কোনো কাজের লোক তাঁর চোখে পড়ে নি, যাকে সিগারেট আনার জন্যে অনুরোধ করা যায়।

'স্যার, আপনার চা।'

নীলু এসে দাঁড়িয়েছে। মোমবাতির আলোয় কী সুন্দর লাগছে তাকে! মিসির আলি বিব্রত স্বরে বললেন, 'চা তো চাই নি।'

'রান্না হতে দেরি হবে। চা খেয়ে খিদেটা চেপে রাখার ব্যবস্থা করুন।'

তিনি চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেন। এবং নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, 'তুমি

আমার নিরাপত্তার জন্যে হঠাৎ এত ব্যস্ত হলে কেন?'

নীলু মৃদু হেসে বলল, 'এই প্রশ্নের জবাব এখন দেব না। একদিন নিজেই বুঝতে পারবেন। চায়ে চিনি হয়েছে কিনা তাড়াতাড়ি দেখুন। আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।'

'হয়েছে।'

নীলু নিঃশব্দে চলে গেল। মিসির আলির হঠাৎ মনে হল, তিনি চাঁপা ফুলের গন্ধ পাচ্ছেন। হালকা সুবাস, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা গাঢ় হল। তিনি ঘরের ভেতর ফিসফিস কথা শুনলেন। কে কথা বলছে? দমকা বাতাসে মোমবাতি নিভে গেল। এবং তিনি স্পষ্ট শুনলেন, মল পরে হেঁটে যাওয়ার মতো কে যেন তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। কে কে বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন। এ সব মনের ভুল। এ জগতে কোনো রহস্য নেই। আশেপাশে নিশ্চয়ই কোনো চাঁপা ফুলের গাছ আছে। গন্ধ আসছে সেখান থেকেই।

কিন্তু তবু তাঁর মনে হচ্ছে, দরজার ওপাশে পর্দার আড়ালে কেউ–এক জন দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। কে সে? অন্য ভুবনের কেউ? নাকি অবচেতন মনে তার জন্ম? পৃথিবীর সমস্ত অশরীরীর জন্মই কি অবচেতন মনে নয়? অবচেতন মন জিনিসটির অবস্থান কোথায়? মস্তিষ্কের নিউরোনে? নিউরোনের বৈদ্যুতিক আবেশই কি আমাদের নানান রকম মায়া দেখাচ্ছে?

তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। পর্দাটি খুব নড়ছে। যেন কেউ পর্দা নাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছে।

তিনি দেয়াশলাই জ্বাললেন। আলো আসুক। আলোর স্পর্শে সব মায়া কেটে যাক। তিনি যেন নিজেকে সাহস দেবার জন্যেই বললেন, 'এ পৃথিবীতে রহস্যের কোনো স্থান নেই।'

১৩

সন্ধ্যাবেলা ওসমান সাহেব নিজে গিয়ে পরীক্ষা করলেন, গেট বন্ধ করা হয়েছে কিনা। তালা টেনে টেনে দেখলেন। দারোয়ানকে বললেন, 'ভোর হবার আগে গেট খুলবে না। কেউ ঢুকতে চাইলে বলবে, বাড়িতে কেউ নেই।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'গেটের তালার চাবি কাউকে দেবে না। এমন কি ফিরোজ যদি চায়, তাকেও দেবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'রাতটা মোটামুটি সজাগ কাটাবে। কোনো শব্দটব্দ হলে বের হয়ে দেখবে কী ব্যাপার।'

'জ্বি আচ্ছা।'

ওসমান সাহেব চিন্তিত মুখে ঘরে ঢুকলেন। ফরিদার সঙ্গে তাঁর দেখা হল, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো কথা হল না। দু' জন এমন ভাব করছেন, যেন কেউ কাউকে চেনেন না। অনিদ্রাজনিত কারণে ফরিদার চোখ লাল। তিনি বসে আছেন মূর্তির মতো। ওসমান সাহেব তাঁর সামনের চেয়ারটাতে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থেকে মৃদু স্বরে বললেন,'ফিরোজ কেমন আছে?'

ফরিদা জবাব দিলেন না।

ওসমান সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, 'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি। কানে যায় নি?'

ফরিদা কোনো সাড়াশব্দ করলেন না। ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন। ওসমান সাহেব চাপা স্বরে বললেন, 'কথার জবাব দাও। ফিরোজ কেমন আছে?'

'ভালো।'

'ভালো মানেটা কি? গুছিয়ে বল।'

'গুছিয়ে বলতে পারব না। তুমি দেখে আস। আর শোন, আমার সঙ্গে এ রকম ভঙ্গিতে কথা বলবে না।'

ফরিদা উঠে গেলেন। রওনা হলেন ফিরোজের ঘরের দিকে। ক্রুদ্ধ আওয়াজ আসছে সে ঘর থেকে। চাপা আওয়াজ। কোনো মানুষের কণ্ঠ থেকে এ ধরনের আওয়াজ হওয়া সম্ভব নয়। যে এমন আওয়াজ করছে, সে মানুষ হতে পারে না। ফরিদার গা কাঁপতে লাগল। কী হচ্ছে এসব! তিনি কি এগিয়ে যাবেন, না ফিরে আসবেন? এগিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা করছে না, কিন্তু তিনি গেলেন।

কাছাকাছি যাওয়ামাত্র ক্রুদ্ধ গর্জন থেমে গেল। তিনি দেখলেন, ফিরোজ বেশ ভালোমানুষের মতো চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। হাতে একটি বই। সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক ভাবভঙ্গি। ফরিদা বললেন, 'কেমন আছিস তুই?'

'ভালো। তুমি কেমন আছ মা?'

ফরিদার চোখে পানি এসে গেল। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে এই প্রথম ফিরোজ এমন স্বরে কথা বলল।

'ফিরোজ, তুই আমাকে চিনতে পারছিস তো?'

'চিনতে পারব না কেন? কী বলছ তুমি!'

'গত দু' দিন তো চিনতে পারিস নি।'

'তোমরাও তো আমাকে চিনতে পার নি।'

'আমরা চিনতে পারব না কেন?'

'না, চিনতে পার নি। চিনতে পারলে নিজের ছেলেকে তালাবদ্ধ করে রাখতে না। তোমরা বিশাল একটা তালা দিয়েছ। হা হা হা।'

ফরিদা কথা ঘোরাবার জন্যে বললেন, 'কিছু খাবি ফিরোজ?'

'হ্যাঁ, খাব। কিন্তু মা, টেবিলে খাবার দেবে। তালা খুলে ফেলবে। আমি খাবার ঘরে টেবিল–চেয়ারে বসে খাব।'

ফরিদা কোনো উত্তর দিলেন না। শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফিরোজ যা বলছে তা সম্ভব নয়। তালা খুলে তাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

'কি মা, কথা বলছ না যে? তালা খুলবে না?'

ফরিদা জবাবা দিলেন না।

'কিন্তু মা তালাবন্ধ করে কাউকে আটকে রাখা ঠিক না। খুব অন্যায়। অন্যায় নয়?'

'হ্যাঁ, অন্যায়।'

'বেশ, তালা খোল।'

ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। তার কোলের ওপর রাখা বইটি মেঝেতে পড়ে গেল, ফিরোজ সেদিকে ফিরেও তাকাল না। সে এগিয়ে এসে জানালার শিক ধরে দাঁড়াল। ফরিদা জানালার পাশ থেকে একটু দূরে সরে গেলেন।

'দূরে চলে গেল যে মা? ভয় লাগছে? হা হা হা। খুব ভয় লাগছে, না?'

ফিরোজ জানালার শিক ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

তিনি ভয় পাওয়া গলায় বললেন, 'এ রকম করছিস কেন?'

'লোহার শিকগুলো কেমন শক্ত, তাই দেখছি।'

'এ রকম করিস না বাবা।'

'তালা খুলে দাও, এ রকম করব না। আমি চিড়িয়াখানার জন্তু নই মা, যে, আমাকে খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রাখবে। যাও, বাবার কাছে যাও। চাবি নিয়ে আস। বন্ধ ঘরে আমার দম আটকে আসছে। আমি খোলা মাঠে খানিকক্ষণ হাঁটব। যাও, যা করতে বলছি কর।

ফরিদা বসার ঘরের দিকে এগুলেন। ফিরোজ জানালার শিক ধরে ঝাঁকাচ্ছে। তার মুখ হাসি হাসি। যেন শিক ঝাঁকান খুব-একটা মজার ব্যাপার। আনন্দের একটা খেলা। খুব ছোটবেলায় ফিরোজ এরকম করত। জানালায় উঠে শিক ধরে ঝাঁকাত।

ওসমান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। কঠিন স্বরে বললেন, 'কি পাগলের মতো কথা বলছ! তালা খুলব মানে? কী হয়েছে তুমি জান না?'

ফরিদা চুপ করে রইলেন।

'একটা ছেলে মারা গেছে। তার পরেও তুমি বলছ তালা খুলব।'

'তালা দিয়েই-বা লাভ কি হচ্ছে? ঐ রাতেও তো তালাবন্ধ ছিল। ছিল না?'

ওসমান সাহেব এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। হ্যাঁ, ঐ রাতে তালাবন্ধ ছিল। এবং ভোরবেলা ঘর তালাবন্ধই পাওয়া গেছে।

ফরিদা বললেন, 'ঐ ছেলের মৃত্যুর সঙ্গে ফিরোজের কোনো সম্পর্ক নেই। ফিরোজ ঘরেই ছিল।'

'ঘরে থাকলেই ভালো।'

ফরিদা স্বামীর পাশে বসলেন। তাঁর মুখ শান্ত। তাঁর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। ওসমান সাহেব বললেন, 'তুমি কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ।'

'বলে ফেল। এভাবে তাকিয়ে থেক না।'

'ফিরোজ প্রসঙ্গে তুমি যে ডিসিশন নিয়েছ, আমার মনে হয় তা ঠিক নয়। তুমি কতদিন তাকে তালাবন্ধ করে রাখবে? ওর চিকিৎসা করাও। মিসির আলিকেই–বা আসতে দিচ্ছ না কেন?'

'ঐ ছেলেটির মৃত্যুর প্রসঙ্গ চাপা না পড়ার আগে আমি কাউকে এ বাড়িতে আসতে দেব না। উনি টেলিফোন করলে বলবে––ফিরোজ মামার বাড়ি গেছে।'

'এতে ফিরোজের অসুখ বাড়তেই থাকবে।'

'বাড়ুক। তুমি নিশ্চয়ই চাও না, তোমার ছেলেকে ওরা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিক। চাও?'

'না, চাই না।'

'তাহলে চুপ করে থাক। একটা তালা আছে, আরেকটা তালা লাগাও।'

'ফিরোজকে শুধু শুধু সন্দেহ করছ। তালাবন্ধ ঘর থেকে সে কী ভাবে বের হবে?'

'তা জানি না। কিন্তু সে বের হয়েছে, এটা আমি যেমন জানি––তুমিও তেমন জান। এই নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না। তুমি অন্য ঘরে যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।'

ঝনঝন শব্দ হচ্ছে ফিরোজের ঘরে। সে প্রচণ্ড শব্দে জানালা ঝাঁকাচ্ছে।

ফরিদা নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করলেন। ওসমান সাহেব বের হয়ে এসে কঠিন স্বরে ফিরোজকে বললেন, 'এরকম করছিস কেন? স্টপ ইট।'

ফিরোজ হাসি মুখে বলল, 'রাগ করছ কেন বাবা?'

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'দরজা খুলে দাও বাবা। আমি খাবার ঘরে বসে ভাত খাব। খিদে লেগেছে। কি, খুলবে না?'

'লোহার রডটা আমার কাছে দে, আমি তালা খুলে দিচ্ছি।'

'না বাবা, ওটা সম্ভব নয়। লোহার রডটা দেয়া যাবে না।'

'কেন দেয়া যাবে না?'

'ও রাগ করবে।'

'কে রাগ করবে?'

'নাম বললে চিনবে? শুধু শুধু জিজ্ঞেস করছ কেন? তালা খুলবে কি খুলবে না?'

ওসমান সাহেব জবাব না দিয়ে চলে এলেন। ফিরোজ জানালা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে খুব হাসতে লাগল।

১৪

থার্ড ইয়ার ফাইনালের ডেট দিয়ে দিয়েছে।

মেডিকেলের ছাত্রদের কারোর দম ফেলার সময় নেই। ক্লাস এখন সাসপেণ্ডেড।

আজমল ঠিক করে রেখেছে, সে এখন থেকে নাশতা খেয়ে পড়তে বসবে এবং একটানা পড়বে লাঞ্চ টাইম পর্যন্ত। এক ঘন্টার ব্রেক নেবে লাঞ্চে, তারপর আবার পড়া। তাছাড়া পাস করার উপায় নেই। নানান দিক দিয়ে খুব ক্ষতি হয়েছে এ বছর। প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো ঝামেলায় পড়া হচ্ছে না। এরকম চললে পরীক্ষা দেয়া হবে না। এবার পরীক্ষায় না বসলে ডাক্তারি পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। খরচ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই। গ্রামের বাড়ি বিক্রি করে দিলে হত, কিন্তু মা বেঁচে থাকতে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া বিক্রি করেও লাভ হবে না কিছু। ভাঙা রাজপ্রাসাদ কে কিনবে? কার এত গরজ?

আজমল বই নিয়ে বসেই উঠে পড়ল--জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে মিসির আলি ঢুকছেন। তার খুব ইচ্ছা হতে লাগল, বইপত্র নিয়ে অন্য কোনো ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ খুঁজে-টুজে তিনি চলে যাবেন। কিন্তু ভদ্রলোকের যা স্বভাব-চরিত্র, তিনি আবার আসবেন। আবার আসবেন। অসহ্য। কেন জানি আজমল তাঁকে সহ্য করতে পারে না। কেন সহ্য করতে পারে না--এ নিয়েও সে ভেবেছে, কিছু বের করতে পারে নি। লোকটি ভালোমানুষ ধরনের, তবে অসম্ভব বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান কেউ ভালোমানুষ হতে পারে না। ভালোমানুষেরা বোকাসোকা ধরনের হয়।

'ভেতরে আসব?'

আজমল বিরক্তি গোপন করে বলল, 'আসুন।'

'আমি পরশুও একবার এসেছিলাম। তোমার রুমমেটকে বলে গিয়েছিলাম, আজ সকালে আসব। সে তোমাকে কিছু বলে নি?'

'জ্বি না, বলে নি। ভুলে গেছে বোধ হয়। বসুন।'

মিসির আলি বসতে বসতে বললেন, 'অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা। এর মধ্যে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। জান বোধ হয়।'

'জ্বি জানি। নাজ চিঠি লিখেছিল।'

'খুব যন্ত্রণায় ফেলেছিলাম ওদের। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।'

আজমল কিছু বলল না।

মিসির আলি বললেন, 'বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'জিজ্ঞেস করুন।'

'তোমাদের বাড়িতে একটা ঘর আছে, যেখানে তোমাদের পূর্বপুরষদের কিছু ছবিটবি আছে। তুমি কি সেই ঘরে ফিরোজকে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'জ্বি হ্যাঁ, নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু ঐ ঘর তো তালাবন্ধ। ওর চাবি থাকে নাজনীনের কাছে। সে তো বলল, ও ঘর খোলা হয় নি।'

'আমার কাছে একটা চাবি আছে, ও জানে না।'

'খালি গায়ে এক জনের ছবি আছে। ঐ ছবিটা কি ফিরোজকে দেখিয়েছ?'

'সব ছবিই দেখিয়েছি।'

'আমি এই বিশেষ ছবিটি প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করছি। শুনেছি এঁকে ক্ষিপ্ত প্রজারা লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এটা কি সত্যি?'

'জ্বি সত্যি। শাবল দিয়ে পিটিয়ে মারে।'

'এই গল্পটি কি তুমি ফিরোজের সঙ্গে করেছ?'

'জ্বি না, করি নি।'

'অন্য কেউ কি করেছে বলে তোমার ধারণা?'

'মনে হয় না। গল্প করে বেড়াবার মতো কোনো ঘটনা এটা না।'

মিসির আলি উঠে পড়লেন। আজমল বলল, 'আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না?'

'না। উঠি এখন। তুমি পড়াশোনা করছিলে, কর। আর ডিসটার্ব করব না।'

আজমল তাঁকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। মিসির আলি বললেন, 'নাজনীন মেয়েটি বড় ভালো। ওকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। চমৎকার মেয়ে।'

আজমল কিছু বলল না।

মিসির আলি বললেন, 'নাজনীন আমাকে বলেছে শীতের সময় একবার যেতে। আমি কথা দিয়েছি, যাব। এ শীতেই যাব। যাই আজমল, আর আসতে হবে না।'

তিনি মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগলেন। ফিরোজ ছবিটা দেখেছে। জট খুলতে শুরু করছে। এই ছবির ছাপ পড়েছে ফিরোজের চেতনায়। এবং মিসির আলির ধারণা, লোকটির মৃত্যুসংক্রান্ত গল্পটিও সে শুনেছে। লোহার রড নিয়ে তার খালি গায়ে বের হবার রহস্যটি হচ্ছে ছবিতে এবং গল্পটিতে।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মিসির আলি গ্রাহ্য করলেন না। বরং বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগিয়ে যেতে তাঁর ভালোই লাগছে। ফিরোজের অসুখের পেছনের কারণগুলো দাঁড় করাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেকগুলো ঘটনাকে এক সঙ্গে মেলাতে হবে। ঘটনাগুলো এ রকম–

(১) অসম্ভব রূপবতী একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। মেয়েটির পলিও। এই ঘটনাটি তাকে অভিভূত করল।

(২) মেয়েটি তাকে আহত করল, সে কড়া গলায় বলল--আমার হাত ছাড়ুন।

(৩) ফিরোজ খালি গায়ের লোকটির ছবি দেখল। এবং খুব সম্ভব তার মৃত্যুবিষয়ক গল্পটিও শুনল।

(৪) রাতে তার প্রচণ্ড জ্বর হল। জ্বরের ঘোরে ঐ লোকটির ছবি বারবার মনে হল।

(৫) সে নির্জন নদীর পাড় ধরে একা-একা হাঁটতে গেল, তখুনি একটি হেলুসিনেশন হল।

মিসির আলি বৃষ্টিতে নেয়ে গেছেন। রাস্তার লোকজন অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে। ঢালাও বর্ষণ উপেক্ষা করে কেউ এমন নির্বিকার ভঙ্গিতে হাঁটে না।

১৫

সাইদুর রহমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'আপনার কী হয়েছে!'

মিসির আলি বললেন, 'শরীরটা খারাপ স্যার।'

'শরীর তো আপনার সবসময়ই খারাপ। এর বাইরে কিছু হয়েছে কি না বলেন। আপনাকে হ্যাগার্ডের মতো দেখাচ্ছে!'

'গত পরশু রাতে কে যেন তালা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করেছে।'

আপনি বাসায় ছিলেন না?'

'আমি তো স্যার প্রথমেই আপনাকে বলেছি তালা ভেঙে ঢুকেছে। কাজেই আমার ঘরে থাকার প্রশ্ন ওঠে না।'

সাইদুর রহমান সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মিসির আলি বললেন, 'আমি ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি। দিন দশেকের ছুটির আমার খুব দরকার।'

সাইদুর রহমান সাহেব মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গেলেন। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস–ট্লাশ তো এমনিতেও হয় না। এর মধ্যে আপনারা ছুটি নিলে তো অচল অবস্থা। এর চেয়ে আসুন, সবাই মিলে ইউনিভার্সিটি তালাবন্ধ করে চলে যাই, কী বলেন?'

মিসির আলি সহজ স্বরে বললেন, 'আপনি কি স্যার আমার সঙ্গে রসিকতা করতে চেষ্টা করছেন?'

'রসিকতা করব কেন?'

'গত দু' বছরে আমি কোনো ছুটি নিই নি। এখন নিতান্ত প্রয়োজনে চাচ্ছি। দিতে না চাইলে দেবেন না। আপনার নিজের কী অবস্থা? এ বছরে আপনি কি কোনো ছুটি নেন নি?'

'অন্যের সঙ্গে সবসময় একটা কমপেয়ার করার প্রবণতাটা আপনার মধ্যে খুব বেশি। এটা ঠিক না মিসির আলি সাহেব। আপনি সি. এল.–এর ফরমটা রেখে যান, আমি রিকমেন্ড করে দেব।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। সাইদুর রহমান বললেন, 'উঠবেন না, আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। বসুন।'

তিনি বসলেন। জরুরী কথাটা কি আঁচ করতে চেষ্টা করলেন। সাইদুর রহমান সাহেবের মুখ হাসি হাসি। কাজেই কথাটা মিসির আলির জন্যে নিশ্চয়ই সুখকর হবে না।

'আপনার পার্ট টাইম অ্যাপয়েন্টমেন্টের মেয়াদ তো শেষ হতে চলল। এক্সটেনশনের জন্যে কী করছেন?'

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমাকে কিছু করতে হবে নাকি। আমার তো ধারণা ছিল, আমার কিছু করার নেই। ইউনিভার্সিটি যা করার করবে।'

সাইদুর রহমান সাহেব কিছু বললেন না। তাঁর চোখ–মুখ উজ্জ্বল। এর মানে কি? তাঁকে কি এক্সটেনশন দেয়া হবে না? সেটা তো সম্ভব নয়। যেখানে ফুল টাইম টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবার কথা, সেখানে পার্ট টাইম চাকরির এক্সটেনশন হবে না? এটা কেমন কথা!

'স্যার, আপনি ঠিক করে বলেন তো ব্যাপারটা কি। আমার মেয়াদ শেষ?'

'এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে এক জনের এডহক অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো হয়েছে। এখন আর আমাদের টিচারের শর্টেজ নেই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই। খাজনার থেকে বাজনা বেশি। ছাত্রের চেয়ে টিচারের সংখ্যা বেশি।'

মিসির আলি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করি নি। আপনি কেন আমার পেছনে লেগেছেন?'

'আরে, এটা কি বলছেন। আমি আপনার পেছনে লাগব কেন? কী ধরনের কথা এসব?'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। আর এখানে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

সাইদুর রহমান সাহেব বললেন, 'কি, চললেন?'

'হ্যাঁ, চললাম।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়? তাঁরা কি কিছু করতে পারবেন? পারবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এ জাতীয় কারোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কম সংখ্যক অধ্যাপককেই তিনি চেনেন।

'স্যার স্লামালিকুম।'

মিসির আলি তাকিয়ে দেখলেন, দু'টি ছাত্র দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন, 'তোমরা কিছু বলবে?'

'জ্বি না স্যার।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

তিনি হাঁটছেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। চাকরি চলে গেলে তিনি অথই পানিতে পড়বেন। সময় ভালো না। দ্বিতীয় কোনো চাকরি চট করে জোগাড় করা মুশকিল। সঞ্চয় তেমন কিছু নেই। ইচ্ছা করলে সঞ্চয় করা যেত। ইচ্ছা করে নি। এ পৃথিবীতে কিছুই জমা করে রাখা যায় না। সব খরচ হয়ে যায়।

মিসির আলি হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে বললেন, I cannot and will not believe that man can be evil.'

তাঁর প্রিয় একটি লাইন। প্রায়ই নিজের মনে বলেন। কেন বলেন? এই কথাটি কি তিনি বিশ্বাস করেন না? যা আমরা বিশ্বাস করি না অথচ বিশ্বাস করতে চাই, তাই আমরা বারবার বলি।

তিনি ঘড়ি দেখলেন। তিনটা বাজে। শরীর খারাপ লাগছে। বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু অনেক কাজ পড়ে আছে। আজমলের সঙ্গে দেখা করা এখনো হয়ে ওঠে নি। ফিরোজের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। তার সঙ্গে দেখা করার সব ক'টি প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। অথচ খুব তাড়াতাড়ি দেখা করা দরকার। সাজ্জাদ হোসেনেরই–বা খবর কি? সে কি হানিফা সম্পর্কে কোনো তথ্য পেয়েছে? না কোনো চেষ্টাই করে নি?

নীলুর সঙ্গেও আর দেখা হয় নি। এর মধ্যে দু' বার গিয়েছেন ঝিকাতলায়। দু' বারই বাসার সামনে থেকে চলে এসেছেন। কেন যে তাঁর লজ্জা লাগছিল। লজ্জার কী আছে? কিছুই নেই। তিনি যাচ্ছেন তাঁর ছাত্রীর বাসায়। এর মধ্যে লজ্জার কী?

লাইব্রেরি থেকে একটা বই ইস্যু করার কথা––'ইল্যুশন অ্যান্ড হেলুসিনেশন' ডঃ জিম ম্যাকার্থির বই। প্রচুর কেইস হিস্ট্রি আছে সেখানে। কেইস হিস্ট্রিগুলো দেখা দরকার। কোনোটার সঙ্গে কি ফিরোজের বা নীলুর ব্যাপারগুলো মেলে? পুরোপুরি না মিললেও অনেক উদাহরণ থাকবে খুব কাছাকাছি। সেগুলো খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

মিসির আলি লাইব্রেরিতে চলে গেলেন। সাধারণত যে বইটি খোঁজা হয়, সে বইটিই পাওয়া যায় না। ভাগ্যক্রমে এটি ছিল। চমৎকার বই। তিন শ'র মতো কেইস হিস্ট্রি আছে। আজ রাতের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে। তিনি স্টিভিনশনের 'সমনোমবলিক প্যাটার্ন' বইটিও নিয়ে নিলেন। এটিও একটি চমৎকার বই। তাঁর নিজেরই ছিল। তাঁর কাজের ছেলেটি পুরান বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দিয়েছে। মহা বদমাশ ছিল। তাঁকে প্রায় ফতুর করে দিয়ে গেছে। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মানুষ কত বিচিত্র! এই ছেলেটিকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। স্নেহ অপাত্রে পড়েছিল। মানুষের বেশির ভাগ স্নেহ–মমতাই অপাত্রে পড়ে।

'কেউ আমার খোঁজ করেছিল, হানিফা?'

'জ্বি না।'

'চা বানিয়ে আন। দুধ–চিনি ছাড়া।'

হানিফা চলে গেল। তার শরীর বোধ হয় খানিকটা সেরেছে। মুখের শুকনো ভাবটা কম। ঘরে ওজন নেবার কোনো যন্ত্র নেই। যন্ত্র থাকলে দেখা যেত, ওজন কিছু বেড়েছে কিনা।

মিসির আলি ইজি চেয়ারে শুয়ে জিম ম্যাকার্থির বইটির পাতা ওল্টাতে লাগলেন। কত বিচিত্র কেইস হিস্ট্রিই না ভদ্রলোক জোগাড় করেছেন।

কেইস হিস্ট্রি নাম্বার সিক্সটি থ্রী
মিস কিং সিলভারস্টোন
বয়স পঁচিশ।
কম্পুটার প্রোগ্রামার।
দি এনেক্স ডিজিটাল্স্ লিমিটেড
ডোভার। ক্যালিফোর্নিয়া

মিস কিং সিলভারস্টোন থ্যাংকস গিভিংয়ের দু' দিন আগে দি এনেক্স ডিজিটাল্স্

লিমিটেডের তিনতলার একটি ঘরে কাজ করছিলেন। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। অফিসের এক জন গার্ড ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। গার্ড একতলায় কফিরুমে। সে বলে গেছে মিস সিলভারস্টোন যেন কাজ শেষ করে যাবার সময় তাকে বলে যান।

কাজেই মিস সিলভারস্টোন রাত আটটার সময় কাজ শেষ করে কফিরুমে গেলেন। অবাক কাণ্ড, কফিরুম অন্ধকার। কেউ কোথাও নেই। তিনি ভয় পেয়ে ডাকলেন--'মুলার।' কেউ সাড়া দিল না।

তিনি ভাবলেন মুলার হয়তো-বা সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছে। কাজেই তিনি ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন-মুলার নেই, তবে সোফায় এক জন অস্বাভাবিক লম্বা মানুষ বসে আছে। মানুষটি নগ্ন। তিনি চেঁচিয়ে ওঠার আগেই লোকটি বলল--'ভয় পেও না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'তুমি কে?'

'আমি এই গ্রহের মানুষ নই। আমি এসেছি সিরাস নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে। আমি পৃথিবীর একটি রমণীর গর্ভে সন্তানের সৃষ্টি করতে চাই।'

মিস সিলভারস্টোন পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। তাঁর পা যেন মেঝের সঙ্গে আটকে গেছে। তিনি চিৎকার করতে চেষ্টা করলেন--গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, একে একে তাঁর গায়ের কাপড় আপনা-আপনি খুলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেলেন। এই লোকটি তখন উঠে দাঁড়াল তিনি লক্ষ করলেন লোকটির গায়ের চামড়া ঈষৎ সবুজ। এবং তার গা থেকে চাপা এক ধরনের আলো বেরুচ্ছে।

লোকটি এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। আপনা-আপনি বাতি নিভে গেল।

এই হচ্ছে মিস কিং সিলভারস্টোনের গল্প। তিনি পরবর্তী সময়ে গর্ভবতী হয়ে পড়েন এবং ডাক্তারের কাছে জানতে চান, তাঁর বাচ্চাটির গায়ের রঙ সবুজ হবার সম্ভাবনা কতটুকু।

ম্যাকার্থির একুশ পৃষ্ঠার বিশ্লেষণ আছে কেইস হিস্ট্রির সঙ্গে। তিনি অভ্রান্ত যুক্তিতে প্রমাণ করেছেন , এটি ইলিউশনের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। মিস সিলভারস্টোন সেখানে দেখেছেন মুলারকে। সিরাস নক্ষত্রপুঞ্জের কোনো আগন্তককে নয়।

মিসির আলি একটির পর একটি কেইস হিস্ট্রি গভীর আগ্রহে পড়তে শুরু করলেন। তাঁর নিজেরও এরকম একটি বই লেখার ইচ্ছা হতে লাগল। সেখানে রানু, নীলু, ফিরোজের কেইস হিস্ট্রি এবং অ্যানালিসিস থাকবে। কিন্তু তা করতে হলে এদের সমস্ত রহস্য ভেদ করতে হবে। তা কি সম্ভব হবে? কেন হবে না? অসম্ভব আবার কী? নেপোলিয়নের কী-একটি উক্তি আছে না এ প্রসঙ্গে-Impossible is the word...? উক্তিটি কিছুতেই মনে পড়ল না।

হানিফা চা বানিয়ে এনেছে। সুন্দর লাগছে তো মেয়েটিকে। মেয়েটির ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে। তিনি কি অলস হয়ে যাচ্ছেন? বোধ হয়। বয়স হচ্ছে। আগের কর্মদক্ষতা এখন আর নেই। মিসির আলি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'আপনের চা।'

'হানিফা চায়ের কাপ সাবধানে নামিয়ে রাখল। তিনি লক্ষ করলেন, মেয়েটি নখে নেলপালিশ লাগিয়েছে। নেলপালিশ তিনি তাকে কিনে দেন নি। সে নিজেই তার জমান টাকা থেকে কিনেছে। তাঁর নিজেরই কিনে দেয়া উচিত ছিল।

'হানিফা বস। তোর সঙ্গে গল্পগুজব করি কিছুক্ষণ।'

হানিফা বসল। মিসির আলি বললেন, 'আমি তোর বাবা-মাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি বুঝলি?'

হানিফা কিছু বলল না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তিনি কি পারবেন এর কোনো খোঁজ বের করতে? না পারার কি আছে? এটি এমন জটিল কাজ নিশ্চয়ই নয়। সাজ্জাদ হোসেন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে তিনি বলেছেন, মেয়েটির নাম, 'ইমা' হবার সম্ভাবনা। এই নামের কোনো নিখোঁজ মেয়ের তথ্য আছে কিনা দেখতে।

সে চোখ-মুখ কুঁচকে বলেছে, 'বুঝলি কি করে , ওর নাম ইমা?' তিনি সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি। দিতে পারেন নি বলাটা ঠিক হল না, বলা উচিত--দিতে পারতেন, কিন্তু দেন নি। সব প্রশ্নের উত্তর সবাইকে দেয়া যায় না। 'ইমা' নামটি কোত্থেকে পাওয়া, সেটা কাউকে না বলাই ভালো, বিশেষ করে পুলিশকে। পুলিশরা এ জাতীয় আধিভৌতিক ব্যাপার সাধারণত বিশ্বাস করে না।

পুলিশের ওপর পুরোপুরি নির্ভরও তিনি করেন নি। তাঁর এক ছাত্রকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। তার কাজ হচ্ছে প্রতিদিন পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরান পত্রিকা ঘাঁটা। দেখবে, 'ইমা' নামের নিখোঁজ মেয়ের কোনো খবর ছাপা হয়েছে কিনা। এই কাজের জন্য সে ঘন্টায় পঞ্চাশ টাকা করে পাবে। দশ ঘন্টার জন্যে পাঁচ শ' টাকা তিনি তাকে আগেই দিয়ে দিয়েছেন। কাজে যাতে উৎসাহ আসে, তার জন্যে এক হাজার টাকার একটি পুরস্কারের কথাও বলেছেন। যদি সে 'ইমা' নামের কোনো নিখোঁজ বালিকার খবর বের করতে পারে, তাহলে এককালীন টাকাটা পাবে।

এই ব্যাপারে মিসির আলির মন খুঁতখুঁত করছে। 'ইমা' নামটির ওপর এতটা গুরুত্ব দেয়া ঠিক হয় নি। যে-কোনো নিখোঁজ বালিকার সংবাদ সংগ্রহ করতে বলাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। এক জনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ওপর এতটা আস্থা রাখা ঠিক নয়। তিনি নিজে এক জন যুক্তিবাদী মানুষ। তাঁর জন্যে এটা অবমাননাকর।

১৬

রাত আটটা।

সাজ্জাদ হোসেন অফিসের টেবিলেই মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করছেন। গত রাতে এক ফোঁটাও ঘুমোন নি। দিনের বেলায়ও ঘন্টাখানেকের মতো শোবার সময় পাওয়া যায় নি। এবং খুব সম্ভব আজ রাতটাও তাঁর জেগেই কাটবে। লোহার রড হাতের সেই নগ্নগাত্র আগন্তুক তাঁর সর্বনাশ করে দিয়েছে। পুলিশ

বাহিনীর নাকের ডগায় আরেকটি খুন হয়েছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। একটি লোক রোজ রাতে লোহার রড হাতে একই জায়গায় ঘোরাঘুরি করবে, অথচ তাকে ধরা যাবে না--এটা কেমন কথা।

'স্যার, আপনার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।'

সাজ্জাদ হোসেন টেবিল থেকে মাথা তুললেন। তাঁর অর্ডারলি দাঁড়িয়ে আছে। এই লোকটির কি কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? তাকে বলে দিয়ে এসেছেন যেন কিছুতেই আগামী দু' ঘন্টার মধ্যে তাঁকে ডাকা না হয়। অথচ দশ মিনিট পার না হতেই ব্যাটা ডাকতে এসেছে। তিনি বরফশীতল গলায় বললেন, 'বল আমি নেই।'

'স্যার, আমি বলেছি যে আপনি আছেন।'

'তাতে অসুবিধা নেই। এখন গিয়ে বল যে, আমার আগের কথাটা ঠিক না। উনি আসলে নেই, কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না।'

'স্যার, উনি এক জন সাংবাদিক। পত্রিকা অফিস থেকে এসেছেন।'

সাজ্জাদ হোসেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। সাংবাদিকদের বিরাগভাজন হবার মতো সাহস তাঁর নেই। পত্রিকায় দীর্ঘ আর্টিকেল বের হয়ে যাবে--'পুলিশ অফিসারের দুর্ব্যবহার।'

'আসতে বল, আর শোন--দু' কাপ চা দিতে বল।'

সাংবাদিক ভদ্রলোকের নাম মীরউদ্দীন। ভদ্রলোক শুধু যে পেশায় সাংবাদিক তাই নয়--চেহারায়, পোশাকে, এমন কি হাবে ভাবেও সাংবাদিক। প্রশ্নের ধরন ডিটেকটিভের মতো। প্রতিটি বাক্যের শেষে একটি খোঁচা আছে, যা ঠিক সহ্য করা মুশকিল। সাংবাদিক, কাজেই সহ্য করতে হবে। এবং কিছুতেই চটান যাবে না। মীরউদ্দিনের কাছ থেকে জানা গেল যে, একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নগ্নগাত্র বিভীষিকা'--এই শিরোনামে একটি প্রচ্ছদ কাহিনী ছাপবে। কাজেই পুলিশের বক্তব্যটি শোনবার জন্যে তিনি দয়া করে এখানে তশরিফ রেখেছেন।

'আমার প্রশ্নের জবাব দিতে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?'

'না, নেই। প্রশ্ন করুন।'

'নগ্নগাত্র ব্যক্তিটি প্রসঙ্গে আপনার কী ধারণা?'

'তেমন কোনো ধারণা নেই। পাগল-টাগল হবে আর কি।'

'তাকে পাগল বলার পেছনে আপনার যুক্তি কি?'

'একটাই যুক্তি-কোনো সুস্থ মাথার লোক একটা লোহার রড নিয়ে খুনখারাবি করে বেড়ায় না।'

'কেন, সুস্থ লোকও তো খুনখারবি করে।'

'তা করে, কিন্তু তার পেছনে কোনো মোটিভ থাকে। এর কান্ডকারখানার পেছনে কোনো মোটিভ নেই।'

'বুঝলেন কি করে, মোটিভ নেই? হয়তো মোটিভ আছে, আপনারা ধরতে পারছেন না।'

সাজ্জাদ হোসেনের বিরক্তির সীমা রইল না। এ তো মহা ত্যাঁদড়ের পাল্লায় পড়া গেল! জ্বালিয়ে মারবে মনে হচ্ছে।

'নগ্নগাত্রকে নিয়ে পুরানা পল্টন এলাকায় গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা কি আপনি জানেন?'

'না, জানি না। কী গুজব?'

'সেটা আপনি নিজেই কষ্ট করে জেনে নেবেন। কারণ পুলিশের উচিত শহরের চালু গুজবগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা। কি, উচিত না?'

সাজ্জাদ হোসেন জবাব দিলেন না। এই লোকের সঙ্গে কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো।

'এখন আপনি দয়া করে বলুন, লোকটিকে ধরবার ব্যাপারে পুলিশ বাহিনী কি চূড়ান্ত রকমের ব্যর্থতার পরিচয় দেয় নি?'

'না। ধরবার চেষ্টা হচ্ছে, শিগগিরই ধরা পড়বে। হয়তো আজ রাতেই ধরা পড়বে

'আচ্ছা, বিদেশে অপরাধীকে ধরবার জন্যে ট্রেণ্ড পুলিশ কুকুর আছে, এরা গন্ধ শুঁকে শুঁকে অপরাধীকে বের করে ফেলে। এখানে এমন কিছু নেই?'

'না নেই। কারণ এটা বিদেশ নয়। বাংলাদেশ।'

'কিন্তু বাংলাদেশে তো পুলিশ বাহিনীর একটা মাউন্টেড রেজিমেন্ট আছে। যার প্রতিটি ঘোড়া লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কেনা। অপ্রয়োজনীয় ঘোড়ার পেছনে এত টাকা খরচ না করে দু'-একটা শিক্ষিত কুকুর কি কেনা যায় না?'

'আমাকে এ সব বলছেন কেন ভাই? আমি সামান্য ব্যক্তি। এ সব কর্তা ব্যক্তিদের বলেন।'

'আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। উচিত কি উচিত না।'

'উচিত তো বটেই।'

সাজ্জাদ হোসেন উঠে পড়লেন। শুকনো গলায় বললেন, 'আমার ডিউটি আছে। আর থাকতে পারছি না।' এই সাংবাদিকের সঙ্গে আরো কিছু সময় কাটালে প্যাঁচে পড়ে যেতে হবে। চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। আজকের ইন্টারভ্যু দিয়েই তাঁর ভয় ভয় লাগছে। না জানি কী ছাপা হয়। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। চাকরি বাঁচিয়ে চলা ক্রমেই মুশকিল হয়ে পড়ছে।

সাজ্জাদ হোসেন জীপ নিয়ে খানিকক্ষণ একা-একা পুরানা পল্টন এলাকায় ঘুরলেন। তারপর খুঁজে বের করলেন মিসির আলির বাড়ি।

এটা সেই বাড়ি, যা 'নগ্নগাত্র' এসে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। তাঁর জানা ছিল না। মিসির আলি সঙ্গে এর পরেও তাঁর দেখা হয়েছে, কিন্তু মিসির আলি এ প্রসঙ্গে কোনো কথা বলেন নি। যেন এটা বলার মতো কোনো ব্যাপার নয়। অথচ মিসির আলিকে দু'-তিন বার স্টেটমেন্ট দিতে হয়েছে। এক জন ইনভেসটিগেটিং অফিসার এসে সব দেখেশুনে গিয়েছে। যথেষ্ট হৈচৈ করা হয়েছে এটা নিয়ে। অন্য যে-কেউ হলে প্রথম

সুযোগেই ঘটনাটা বন্ধু–বান্ধবদের বলত। মিসির আলি বলেন নি। লোকটি কি ইচ্ছে করেই নিজেকে আলাদা প্রমাণ করবার জন্যে এ রকম করে?

সাজ্জাদ হোসেন কড়া নাড়লেন। মিসির আলি ঘরেই ছিলেন। তিনি দরজা খুললেন। সাজ্জাদ হোসেনকে দেখে বিন্দুমাত্র অবাক হলেন না। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল তিনি যেন বন্ধুর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, 'খবর কি তোর?'

'ভালো।'

'খোঁজ নিতে এলাম টিকে আছিস, না নগ্নগাত্র এসে তোকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিয়ে গেছে।'

'না, এখনো বানায় নি।'

'তোর 'ইমা'র পাত্তা এখনো লাগাতে পারি নি। পারলেই জানবি।'

'পারার সম্ভাবনা কী রকম?'

'কম। খুবই কম। ঠাণ্ডা পানি খাওয়াতে পারবি? খুব ঠাণ্ডা।'

'ঠাণ্ডা পানি হবে না। ঘরে ফ্রীজ নেই।'

'বাড়িওয়ালার ঘরে নিশ্চয়ই আছে। তোর ইমাকে পাঠিয়ে দে না, নিয়ে আসুক। ঠাণ্ডা পানি খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।'

মিসির আলি ইমাকে পাঠালেন না। নিজেই ঠাণ্ডা পানির বোতল নিয়ে এলেন। সাজ্জাদ হোসেন টেবিলে পা তুলে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। দেখলেই মায়া লাগে। লোকটির ওপর দিয়ে ঝড় যাচ্ছে। মিসির আলি বললেন, 'চা খাবি?'

'না। তোর সোফায় ঘন্টাখানিক শুয়ে থাকব।'

'সোফায় কেন? বিছানায় শুয়ে থাক।'

'সোফা হলেই চলবে। বিছানা লাগবে না। তুই কাঁটায় কাঁটায় এক ঘন্টা পরে ডেকে তুলবি।'

'ঠিক আছে, তুলব।'

সাজ্জাদ হোসেন সোফায় লম্বা হলেন এবং দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তবে তাঁকে ডেকে তুলতে হল না। ঠিক এক ঘন্টা পরে নিজে নিজেই জেগে উঠলেন। প্রাণী হিসেবে মানুষের তুলনা নেই। তার অবচেতন মন সর্বক্ষণ কাজ করে। যথাসময়ে তাকে সজাগ করে দেয়। বিপদের আভাস দিতে চেষ্টা করে। মুশকিল হচ্ছে তার কর্মপদ্ধতি আমাদের জানা নেই। সাজ্জাদ হোসেন বললেন, 'এক কাপ চা খাব। তারপর যাব। আজ সারারাত ডিউটি। যেভাবেই হোক, আজ নগ্নগাত্রকে ধরবই।'

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, 'ম্যানিয়াকদের ধরা খুব মুশকিল। এদের ইন্দ্রিয় খুব সজাগ থাকে।'

'সজাগ থাকুক আর যা–ই থাকুক, ব্যাটাকে আজ ধরবই।'

'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দেশ খোদ ইংল্যান্ডেও কিন্তু কিছু কিছু ম্যানিয়াকদেরকে ধরতে তিন–চার বছর সময় লেগেছে। এক জনের নাম তুই নিশ্চয়ই জানিস––রোড সাইড

স্ট্রাংগলার। বেছে বেছে ব্লন্ড মেয়েদের খুন করত। সাড়ে ছ' বছর চেষ্টা করেও কিন্তু ওকে ধরা যায় নি।'

'আমি ধরব। আজ রাতেই ধরব।'

মিসির আলি চুপ করে গেলেন। সাজ্জাদ হোসেন বললেন, 'উঠি?'

'চা না খাবি বললি?'

'মত বদলেছি, খাব না।'

মিসির আলি বললেন, 'আমি কি তোর সঙ্গে যেতে পারি?'

'আমার সঙ্গে যাবি? কেন?'

'আমি ধানমণ্ডির একটা বাড়িতে ঢুকতে চাই। ওরা ঢুকতে দিচ্ছে না। গেট বন্ধ করে রাখছে এবং বলছে বাড়িতে কেউ নেই। কিন্তু আমি জানি বাড়িতে লোকজন আছে। পুলিশের গাড়িতে করে গেলে দারোয়ান ভয় পেয়ে গেট খুলবে।'

'আজ রাতেই যেতে হবে?'

'হুঁ।'

'তোকে ঢুকতে দিচ্ছে না কেন?'

'আছে, অনেক ব্যাপার আছে পরে বলব। আমাকে ও-বাড়িতে নামিয়ে দিতে তোর অসুবিধা আছে? অসুবিধা থাকলে থাক।'

'না, অসুবিধা নেই।'

রাত সাড়ে দশটার মতো বাজে।

দারোয়ান জেগেই ছিল। মিসির আলি যা ভেবেছিলেন, তা-ই হল। পুলিশ এসেছে শুনে সে গেট খুলল। মিসির আলি ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

ওসমান সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী দু' জনেই দোতলার বারান্দা থেকে দেখলেন, মিসির আলি গেট দিয়ে ঢুকছেন এবং বেশ সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে আসছেন। ওসমান সাহেব নিচে নেমে এলেন। মিসির আলি বললেন, 'আপনি ভালো আছেন?'

ওসমান সাহেব সে প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিসির আলি বললেন, 'অসময়ে এসেছি। উপায় ছিল না বলেই আসতে হয়েছে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।'

১৭

ওসমান সাহেবের বসার ঘর। রাত প্রায় এগারটা। একটি কম পাওয়ারের টেবিল ল্যাম্প ছাড়া ঘরে কোনো আলো নেই। আবছা অন্ধকার। এই আবছা অন্ধকার ঘরে তিন জন মানুষ মুখোমুখি বসে ছিলেন। এক জন উঠে চলে গেলেন। ফরিদা। তিনি নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। যে আলোচনা চলছিল, তা তাঁর সহ্য না হওয়ায় উঠে গেছেন। এখন বসে আছেন দু' জন--মিসির আলি এবং ওসমান সাহেব। কথাবার্তা এখন বিশেষ হচ্ছে না।

ওসমান সাহেবের যা বলার তা বলেছেন। এখন আর তাঁর কিছু বলার নেই। তিনি বসে আছেন মূর্তির মতো। দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর মধ্যে জীবনের ক্ষীণতম স্পর্শও নেই। যেন এক জন মরা মানুষ।

মিসির আলি বললেন, 'আপনি বলছেন, ফিরোজকে তালাবন্ধ করে রেখেছেন।'

'হ্যাঁ।'

কবে থেকে?'

'আজ নিয়ে ছ' দিন।'

'এটা তো বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। কারণ এই ছ' দিনে বেশ ক'বার সে বের হয়ে গেছে। পুরানা পল্টন এলাকায় তাকে দেখা গেছে। পত্রিকায় নিউজ হয়েছে।

ওসমান সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'কী ভাবে কী হচ্ছে আমি জানি না। আমি যা করেছি, সেটা বললাম। তালা দেয়া আছে। আপনি নিজে গিয়ে দেখতে পারেন।'

'সেই তালার চাবি কার কাছে? অর্থাৎ আমি জানতে চাচ্ছি, অন্য কেউ তালা খুলে দিতে পারে কিনা।'

'না, পারে না। কারণ চাবি আমার কাছে।'

'অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন তালাবন্ধ করে রাখা সত্ত্বেও সে বের হয়ে পড়ছে।

'আমি কিছুই বলতে চাচ্ছি না। আপনার যা ইচ্ছা মনে করতে পারেন।'

মিসির আলি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমি কোনো আধিভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাস করি না। এক জনকে তালাবন্ধ করে রাখা হবে, কিন্তু তবু সে বের হয়ে যাবে--এটা আর যে-ই বিশ্বাস করুক, আমি করব না।

'বিশ্বাস করতে আমি আপনাকে বলছি না। আপনি নিজে গিয়ে দেখুন। সেটা না করে আপনি একই কথা বারবার আমাকে বলছেন কেন?'

'সেটা বলছি, কারণ আমি আগে সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে চাই। ওসমান সাহেব, আমি--আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই, আমি এই ছেলেটিকে সুস্থ করে তুলতে চাই। আপনি আমাকে শত্রু পক্ষ মনে করছেন, এটা ঠিক না। আমার কোনো পক্ষ নেই। আমি এক জন চিকিৎসক।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন এবং সহজ স্বরে বললেন, 'চলুন ফিরোজের ঘরটা দেখে আসি।'

'আপনি একাই যান, আমি যাব না।'

'আপনি যাবেন না কেন?'

'আমার সহ্য হয় না। আমি নিজেও পাগল হয়ে যাব।'

মিসির আলি একাই রওনা হলেন।

ফিরোজের ঘর নিঃশব্দ। সে এই গরমেও চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিসির আলি চমকে উঠলেন। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। গালের হনু উঁচু হয়ে আছে। সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণের কিছুই নেই, কেমন কালি মেরে

গেছে। মিসির আলি লক্ষ করলেন, ফিরোজের হাতের নখ বড় বড় হয়েছে। নখের নিচে ময়লা জমে দেখাচ্ছে শকুনের নখের মতো। ঘুমের মধ্যেই ফিরোজ পাশ ফিরল। মিসির আলি লক্ষ করলেন, সে হাঁ করে ঘুমাচ্ছে এবং মুখ দিয়ে লালা পড়ে বিছানার একটা বেশ বড় অংশ চটচটে হয়ে আছে। কুৎসিত একটা দৃশ্য।

ঘরের একটিমাত্র দরজা, সেখানে সত্যি সত্যি বিরাট একটা তালা ঝুলছে। দু' দিকে দু'টি বিশাল জানালা। জানালায় লোহার গ্রিল। সেই গ্রিল ভেঙে বের হওয়া অসম্ভব। সুস্থ মানুষ দূরের কথা, এক জন পাগলও সেই চেষ্টা করবে না।

মিসির আলি বসার ঘরে ফিরে এলেন। ওসমান সাহেব বললেন, 'ঘর যে বন্ধ, এটা আপনার বিশ্বাস হয়েছে?'

'হ্যাঁ হয়েছে।'

'এখন বলুন সে কিভাবে বের হয়?'

'ফিরোজের ঘরের সঙ্গে একটা এ্যাটাচড বাথরুম আছে। বাথরুমের ভেতরটা আমি দেখতে পাই নি। তবে আমার ধারণা, বাথরুমে বেশ বড় একটি ভেন্টিলেটার আছে, এবং ফিরোজ সেই ভেন্টিলেটার দিয়ে বের হয়।'

ওসমান সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। সিগারেট ধরালেন। মিসির আলি লক্ষ করলেন, সিগারেট ধরাতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপছে। মিসির আলি বললেন, 'এক্ষুণি আপনি ভেন্টিলেটার বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন। আজ রাতে যেন সে বের হতে না পারে।'

'হ্যাঁ, করছি।'

'আমি এখন চলে যাব। কিন্তু কাল ভোরে আবার আসব। আপনার দারোয়ানকে বলে দিন, যাতে সে আমাকে ঢুকতে দেয়।'

'হ্যাঁ আমি বলব। মিসির আলি সাহেব।'

'বলুন।'

'আমার ছেলে কি কোনোদিন সুস্থ হয়ে উঠবে?'

'নিশ্চয়ই হবে। হতেই হবে।'

'এত রাতে আপনি বাড়ি গিয়ে কি করবেন? থেকে যান এখানে।'

'না, থাকতে পারব না। আমার সঙ্গে একটা ছোট মেয়ে থাকে, সে একা ভয় পাবে। আপনি দেরি না করে ভেন্টিলেটারটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন।'

'করছি। এক্ষুণি করছি।'

ফরিদা ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত মনে হল। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, এবং তিনি কাঁপছেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। ফরিদা থেমে বললেন, 'মিসির আলি সাহেব, ফিরোজ জেগেছে। আপনাকে ডাকছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'কেমন আছ ফিরোজ?'

'ভালো আছি। তুই কেমন আছিস?'

মিসির আলি চমকে উঠলেন। ভারি গম্ভীর গলায় কথা বলছে ফিরোজ। চোখে-মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি। সে পায়ের ওপর পা তুলে চেয়ারে বসে আছে।

'তুই তুই করে বলছি বলে রাগ করছিস না তো? তুই তো আবার প্রফেসর মানুষ।

'রাগ করছি না, তবে দুঃখিত হচ্ছি। সবাইকে সবার প্রাপ্য সম্মান দেয়া উচিত।'

'তা উচিত। কিন্তু মুশকিল কি জানিস, সারা জীবন তুই ছাড়া কোনো সম্বোধন করি নি। আমাকে চিনতে পারছিস তো? তুই তো গিয়েছিলি আমাদের বাড়িতে।'

মিসির আলি চুপ করে রইলেন। যে কথা বলছে, সে ফিরোজ নয়। ফিরোজের দ্বিতীয় সত্তা। সেকেন্ড পার্সোনালিটি।

'কি রে, চুপ করে আছিস কেন? ভয় পাচ্ছিস? হা হা হা।'

'না, ভয় পাচ্ছি না।'

'খাঁচায় আটকে রেখেছিস, ভয় পাবি কেন? ছেড়ে দে, তারপর দেখি তোর কত সাহস।'

'আমার সাহস কম।'

'এই তো একটা সত্যি কথা বললি। হ্যাঁ, তোর সাহস কম--তবে তোর বুদ্ধি আছে। মাথা খুব পরিষ্কার। বোকা বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো।'

'আমি কারো শত্রু নই।'

'বাজে কথা বলিস না। তুই আমার শত্রু মহা শত্রু।'

'কেমন করে?'

'তুই ফিরোজকে সারিয়ে তুলতে চাচ্ছিস। ওকে সারিয়ে তুললে আমি যাব কোথায়? ডাণ্ডাপেটা করব কীভাবে? তুইই বল।'

ডাণ্ডাপেটা করতেই হবে?'

'করব না? বলিস কি তুই! আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে, আমি ছেড়ে দেব? পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলব।'

'লাভ কী তাতে?'

'লাভ-লোকসান জানি না। ছোট চৌধুরী লাভ-লোকসানের পরোয়া করে না। তোকে আমি একটা শিক্ষা দেব। এক বাড়ি মেরে টপ করে মাথাটা ফাটিয়ে দেব। গল-গল করে ঘিলু বের হয়ে আসবে। ছিটকে আসবে রক্ত। বড় মজার ব্যাপার হবে। তবে তুই দেখতে পাবি না। আফসোসের কথা।'

মিসির আলি তাকিয়ে দেখলেন, এ বাড়ির প্রায় সবাই এসে জড় হয়েছে। চোখ বড় বড় করে শুনছে এই অস্বাভাবিক কথোপকথন। কাঁদছেন শুধু ফরিদা।

ফিরোজ হিসহিস করে উঠল, 'কি, চুপ করে আছিস যে? কথা বলছিস না কেন? ভয় পেয়েছিস? ভয় পেয়ে শেষটায় মেয়েমানুষের আঁচল ধরলি? লজ্জা করে না?'

'কার কথা বলছ?'

'ওরে হারামীর বাচ্চা, তুই জানিস না কার কথা বলছি? তোর পেয়ারের নীলু বেগম। যার ইয়ে দুটি---। এবং যার ইচ্ছে হচ্ছে---।'

কুৎসিত সব কথা। সে একনাগাড়ে বলে যেত লাগল। কদর্য অশ্লীলতা। যা ছাপার অক্ষরে লেখার কোনো উপায় নেই। ফিরোজ যে-সব কথা বলতে লাগল, তার ভগ্নাংশও অশ্লীলতম পর্ণো পত্রিকায় থাকে না। ফরিদা দ্রুত ঘরে চলে গেলেন। কাজের লোকগুলি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ওসমান সাহেব ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'শাট আপ।'

ফিরোজ হাসিমুখে তাকাল ওসমান সাহেবের দিকে। যেন খুব মজার কথা বলছে, এমন ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'আমাকে ইংরেজিতে গাল দিচ্ছে। বাহ্ বেশ মজা তো! কাকে তুই ইংরেজিতে গাল দিচ্ছিস? তোর নাড়ী-নক্ষত্র আমি জানি। সালেহা নামের কাজের মেয়েটির সঙ্গে তুই কী করেছিস, বলে দেব? খুব মজা পেয়ে গিয়েছিলি, তাই না? ক'দিন খুব সুখ করে নিলি। বলব কী করেছিলি? বলব? হা হা হা। কি, পালিয়ে যাচ্ছিস কেন? লজ্জা লাগছে? ফুর্তি করার সময় লজ্জা লাগে নি? একটা ঘটনা বরং বলেই ফেলি---।'

ওসমান সাহেব বললেন, 'মিসির আলি সাহেব, আপনি চলে আসুন।'

'আপনি বসার ঘরে গিয়ে বসুন। আমি আসছি।'

'তুই যাচ্ছিস না কেন? কথাগুলো শুনতে মজা লাগছে? তোর ইয়ে--- (কিছু কুৎসিত কথা)।'

মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'ফিরোজ, চুপ কর।'

'ঠিক আছে, চুপ করলাম। তুই আজ রাতে কোথায় থাকবি?'

'বাসাতেই থাকব।'

'তাহলে দেখা হবে।'

'না, দেখা হবে না। বাথরুমের ভেন্টিলেটার বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ফিরোজের কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করল। চেয়ার। ভাঙল, লাথির পর লাথি বসাতে লাগল পালঙ্ক। কাপ বাটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। চোখে দেখা যায় না। এমন ব্যাপার। ভয়াবহ উন্মত্ততা। মনে হয় না এ কোনো দিন শান্ত হবে। মিসির আলি একটি সিগারেট ধরালেন। ফিরোজ চাপা গলায় গর্জন করছে। ক্রুদ্ধ পশুর গর্জন। সমস্ত আবহাওয়াই দূষিত হয়ে গেছে। নরকের একটি ক্ষুদ্র অংশ নেমে এসেছে এখানে।

মিসির আলি দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের বললেন, 'তোমরা যাও। বারান্দার বাতি নিভিয়ে দাও। ও আপনা-আপনি শান্ত হবে।'

১৮

নাজনীন একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নটি দেখেছে ছাড়া ছাড়া ভাবে। তবু সব মিলিয়ে একটা অর্থ দাঁড় করান যায়। এবং অর্থটি ভয়াবহ। নাজনীন দেখেছে--একটা

ছোট ঘরের এক প্রান্তে একটি বিছানা। বিছানাটিতে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে এক জন লোক শুয়ে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ আরেক জন লোক ঘরে ঢুকল। লোকটার হাতে একটা লোহার রড। লোকটি টান দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা লোকটির ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলল। লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে। এবং সেটি একটি পরিচিত মুখ–মিসির আলির মুখ। স্বপ্নের মধ্যেই প্রচণ্ড একটা শব্দ হল, এবং দেখা গেল মিসির আলির মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

নাজনীন জেগে উঠল চিৎকার করে। স্বপ্ন এত ভয়াবহ হয়! নাজনীন বাকি রাতটা আর ঘুমুতে পারল না। ছ' রাকাত নফল নামাজ পড়ল। কোরান শরীফ পড়ল। মন শান্ত হল না। নাজনীনের মা বললেন একটা ছদকা দিয়ে দিতে। প্রাণের বদলে প্রাণ। সেই ছদকা তো ভোর না হবার আগে দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই কঠিন। নাজনীন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খানিকক্ষণ কাঁদল। সে জানে এটা স্বপ্ন। স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না। তবু এমন লাগছে কেন?

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে একটি টেলিগ্রাম পাঠাল, 'সাবধান থাকবেন।' টেলিগ্রামটি পাঠিয়েই মনে হল, এর অর্থ তো উনি কিছুই বুঝবেন না। তিন ঘন্টা পর দ্বিতীয় একটি টেলিগ্রাম করল। এই টেলিগ্রামটি বেশ দীর্ঘ।

'চাচা, আপনার সম্বন্ধে খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। একটি লোক লোহার রড দিয়ে আপনার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আপনাকে অনুরোধ করছি, সাবধানে থাকবেন। নাজনীন।'

১৯

নিজের মেয়েকে চিনতে না পারার মতো কষ্টের কি কিছু আছে? জাহিদ সাহেব বসে বসে তাই ভাবেন। তাঁর বড় অস্থির লাগে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। এ রকম হবে, জানতেন। দুই মেয়ে বড় হবে--এদের বিয়ে হবে, আলাদা জীবন হবে। তিনি পড়ে থাকবেন একা। এ অবস্থা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। পুরোপুরি সে রকম অবশ্যি হয় নি। এক মেয়ে তাঁর সঙ্গেই আছে। কিন্তু এই মেয়েকে তিনি চেনেন না। এ এক অচেনা নীলু।

আজ দুপুরে খেতে গিয়ে দেখেন, মাংসের ভুনা তরকারি এবং খিচুড়ি করা হয়েছে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'আজ খিচুড়ি যে!'

নীলু বলল, 'তুমি খেতে চেয়েছিলে, তাই।'

জাহিদ সাহেব খেতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কাউকে সে কথা বলেন নি। নীলুর সঙ্গে গতকাল রাত থেকেই তাঁর কোনো কথা হয় নি। অথচ সে ঠিকই জানল। শুধু আজই নয়, এ রকম প্রায়ই হয়। বড় অস্বস্তি লাগে। শুধু অস্বস্তি নয়, একটু ভয় ভয়ও করে। একেক রাতে ভয়টা অসম্ভব বেড়ে যায়। কেন বাড়ে, তাও তিনি জানেন না। তাঁর ইচ্ছা করে সব ছেড়ে ছুঁড়ে দূরে কোথাও চলে যান। যেখানে কেউ তাঁর কোনো

খোঁজ পাবে না।

প্রথম এ রকম হল বিলুর বিয়ের চারদিন পর। বিলু নেই। বিয়েবাড়ির আত্মীয়-স্বজনরা সব চলে গেছে। বাড়ি একেবারেই খালি। মন-টন খারাপ করে জাহিদ সাহেব নিজের ঘর ছেড়ে ঘুমাতে গেলেন নীলুর পাশের ঘরে। এক জন কেউ থাকুক আশেপাশে। যাতে ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়।

অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর ঘুম এল না। সামনের জীবন কেমন কাটবে, তাই নিয়ে ভাবতে লাগলেন। মৃত স্ত্রীর কথা মনে করে খানিকক্ষণ কাঁদলেন। প্রথম জীবনে একটি ছেলে হয়েছিল--দেড় বছর বয়সে মারা যায়। মিষ্টি কথা বলত। পাখিকে বলত 'বাকি।' ফুলকে বলত 'কুল'। অনেক দিন পরে মৃত ছেলের কথা মনে করেও চোখ মুছলেন। আর ঠিক তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। চাঁপা ফুলের তীব্র গন্ধে অভিভূত হয়ে গেলেন। ব্যাপার কী! ফুলের গন্ধ আসছে কোত্থেকে? তাঁর নিজের এক সময় বিরাট ফুলের বাগান ছিল। সে-সব আর কিছু নেই। বাগান জঙ্গল হয়েছে।

জাহিদ সাহেব অবাক হয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই নূপুরের শব্দ শুনলেন। খুব হালকা, কিন্তু স্পষ্ট। এর মানে কী? তিনি নীলুর ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। আশ্চর্য! নীলু যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। গভীর রাতে কে এসেছে নীলুর ঘরে? জাহিদ সাহেব ভয়ার্ত গলায় ডাকলেন, 'নীলু, ও নীলু।'

নীলু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলল।

'কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

'আছে এক জন। তুমি চিনবে না।'

জাহিদ সাহেব ঘরে উঁকি দিলেন। কাউকে দেখতে পেলেন না। নীলু বলল, 'ঘুমিয়ে পড় বাবা। এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন?'

জাহিদ সাহেব বললেন, 'কী হচ্ছে এ সব! কার সঙ্গে কথা বলছিলি?'

'ও তুমি বুঝবে না বাবা।'

'বুঝব না মানে? বুঝব না মানে কী?'

'অনেক কথা বাবা। পরে তোমাকে বলব।'

'না, এখনি শুনব।'

নীলু বলল, এবং নীলুর কথা তিনি কিছুই বুঝলেন না। এক জন কেউ নীলুর সঙ্গে আছে--যে নীলুকে তার মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছিল। কী অদ্ভুত কথা!

জাহিদ সাহেব দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে লাগলেন। তাঁর ধারণা হল, নীলুর বড় কোনো অসুখ হয়েছে। তিনি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বললেন। দু' জন পীরের কাছ থেকে তাবিজ আনালেন। সেই সব তাবিজ পরতে নীলু কোনো আপত্তি করল না। ডাক্তারদের ওষুধপত্র খেতেও তার কোনো অনীহা দেখা গেল না। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। এবং হবেও না কোনোদিন। তাঁর বাকি জীবন কাটবে অদ্ভুত এই নীলুকে সঙ্গে নিয়ে--যাকে তিনি চেনেন না, বোঝেন না। যে মনের কথা বুঝে ফেলে। যার ঘরে অপরিচিত এক রমণীকণ্ঠ শোনা যায় এবং দমকা হাওয়ার মতো চাঁপা ফুলের গাঢ় গন্ধ যাকে

হঠাৎ ঘিরে ফেলে।

আজ বুধবার। আকাশে মেঘ নেই। রৌদ্রোজ্জ্বল একটি সুন্দর সকাল। জাহিদ সাহেব অনেক দিন পর উৎফুল্ল বোধ করলেন। তাঁর মনে হল, দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে। নীলু ভালো হয়ে যাবে। তাঁর চমৎকার একটি বিয়ে হবে। ছেলেপুলে আসবে তাদের সংসারে। সেই সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর শেষ জীবন ভালোই কাটবে। এক জন মানুষ তো সারা জীবন দুঃখী থাকতে পারে না। দুঃসময়ের পর আসে সুসময়। জীবনচক্রের এই এক কঠিন নিয়ম। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে দুঃসময়টা দীর্ঘ হয়, এই যা। যেমন তাঁর হয়েছে।

জাহিদ সাহেব ডাকলেন, 'নীলু, নীলু মা।' অনেক দিন পরে তাঁর কণ্ঠে আনন্দ ঝরে পড়ল।

নীলু এল না। তিনি উঁকি দিলেন নীলুর ঘরে। তার ঘর অন্ধকার। দরজা জানালা বন্ধ। পর্দা টেনে দেয়া ঘরের বাতাস ভারি হয়ে আছে।

'কী হয়েছে নীলু?'

'কিছু হয় নি।'

'এভাবে শুয়ে আছিস কেন? শরীর ভালো না?'

তিনি নীলুর কপালে হাত দিলেন। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। নীলুর চোখ-মুখ রক্তবর্ণ। তিনি হতভম্ব হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে মা?'

'কিছু হয় নি।'

'কিছু হয় নি, মানে? তোর গায়ে তো প্রচণ্ড জ্বর। কখন জ্বর এল? ডাক্তার ডাকা দরকার। এক্ষুণি দরকার।'

'বাবা, এই নিয়ে তুমি ভাববে না। কাউকে ডাকার দরকার নেই।'

'দরকার নেই, বললেই হল।'

'বাবা, তোমায় পায়ে পড়ি। আমাকে একা থাকতে দাও। বিরক্ত করো না। ভয় নেই, জ্বর সেরে যাবে।'

জাহিদ সাহেব লক্ষ করলেন, নীলু কাঁদছে।

'মা, কি হয়েছে তোর?'

'কিচ্ছু হয় নি বাব। আমি সেরে যাব। আমি আবার আগের মতো হব। যে আমার সঙ্গে থাকত, সে আমাকে বলেছে।'

'সে কে?'

'আমি নিজেও জানি না, সে কে। এক মহাবিপদে সে আমাকে রক্ষা করেছিল। বাবা, তুমি যাও।'

জাহিদ সাহেব মুখ কালো করে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। চমৎকার ভাবে যে দিনটি শুরু হয়েছিল, সেটি খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। তিনি খবরের কাগজ হাতে নিয়ে একা-একা বারান্দায় বসে রইলেন।

২০

বুধবার। সময় সাতটা দশ।

সন্ধ্যার ঠিক পরপর মিসির আলি নিউ ইস্কাটন রোডের যে তিনতলা দালানের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তার নাম--'নিকুঞ্জ'--লোকজন বিশাল প্রাসাদ তৈরি করে নাম দেয়--কুটির। এ রকম বাড়ির নাম কেউ কুটির রাখে?

বাড়ির সামনে ফুটবলের মাঠের মতো বড় লন। লনের ঘাস বড় বড় হয়ে আছে। লনের চারদিকে একসময় ফুলের বাগান ছিল। এখন নেই। শ্বেতপাথারের একটি শিশুমূর্তি (সম্ভবত ফোয়ারা) আছে মাঝখানে, তাতে শ্যাওলা পড়েছে। চারদিকে অবহেলা ও অযত্নের ছাপ।

মিসির আলির মনে হল--এ বাড়ির মালিক দেশে থাকেন না। চাকর-বাকরের হাতে বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে তিনি থাকেন বিদেশে। হঠাৎ হঠাৎ আসেন, আবার চলে যান। মিসির আলি খানিকটা শঙ্কিত বোধ করলেন। বাড়ির মালিক এস· আকন্দ সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া খুবই জরুরী। কারণ মিসির আলির ছাত্র শেষ পর্যন্ত 'ইমা' নামের একটি মেয়ের খবর পত্রিকায় পেয়েছে। খবরের শিরোনাম--হারিয়ে গেল ইমা। ডল হাতে তিন বছর বয়সী একটি বালিকার ছবি আছে খবরের সঙ্গে।

মেয়েটি তার বাবা-মার সঙ্গে ঢাকা থেকে খুলনা যাচ্ছিল। খুব চঞ্চল মেয়ে। সারাদিন ছোটাছুটি করেছে। স্টীমারে উঠে তার খুব ফূর্তি। এক জন আয়া তার সঙ্গে সঙ্গে। বরিশাল থেকে স্টীমার ছাড়ার কিছুক্ষণ পরই আয়া দেখল ইমা নেই। সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে একা-একা নিচে নেমে গেছে? সে ছুটে এল নিচে। সেখানেও ইমা নেই। সে কি রেলিং টপকে নদীতে পড়ে গেছে? আয়া ভয়ে-আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গেল। ইমার বাবা-মা তখনো কিছু জানেন না। তাঁরা টেলিস্কোপিক লেন্স লাগিয়ে দূরের একটি মাছধরা নৌকার ছবি তোলার চেষ্টা করছেন।

এ জাতীয় বাড়িগুলোতে সাধারণত দারোয়ান এবং কুকুর থাকে। কিন্তু এ বাড়িতে দুটোর কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না। মিসির আলি অনেকটা দ্বিধা নিয়েই গেটের ভেতর ঢুকলেন। কলিং বেল থাকার কথা। তাও চোখে পড়ছে না। তবে বাড়িতে লোক আছে। আলো জ্বলছে।

আচ্ছা, এ রকম হওয়া কি সম্ভব যে, এ বাড়িতে এস· আকন্দ নামের কেউ থাকেন না। এক কালে ছিলেন, এখন নেই। কিংবা খবরের কাগজে যে এস· আকন্দের কথা আছে, ইনি সেই ব্যক্তি নন।

হওয়া অসম্ভব নয়। তবে সাজ্জাদ হোসেন বেশ জোর দিয়েই বলেছেন-এটিই ঠিকানা। খবরের কাগজের কাটিং থেকে ঠিকানা বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সাজ্জাদ হোসেনকে। এটি মনে হচ্ছে তিনি ঠিকই করেছেন।

কলিং বেল খুঁজে পাওয়া গেল না। মিসির আলি দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলে

গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

'কাকে চান?'

'এটা কি আকন্দ সাহেবের বাড়ি? এস· আকন্দ?'

'জ্বি।'

'উনি কি আছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'উনি খুবই ব্যস্ত। আজ রাত দু'টার ফ্লাইটে লণ্ডন চলে যাচ্ছেন। আপনার কী দরকার বলুন?'

'আমার খুবই দরকার।'

'আমাকে বলুন।'

'আমি তাঁকেই চাই। বেশি সময় লাগবে না। পাঁচ মিনিট সময় নেব।'

'ঠিক আছে বসুন, আমি দেখি।'

মিসির আলি সাহেব বসার ঘরে একা-একা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসে রইলেন। বসার ঘরটি সুন্দর। অসংখ্য দর্শনীয় জিনিসপত্র দিয়ে জবড়জং করা হয় নি। ঘাস রঙের একটা কার্পেটে নিচু নিচু বসার চেয়ার। দেয়ালে একটিমাত্র পেইনটিং-চার-পাঁচ জন গ্রামের ছেলেমেয়ে পুকুরে সাঁতার কাটতে নেমেছে। অপূর্ব ছবি। ছবিটির জন্যেই বসবার ঘরে একটি মায়া-মায়া ভাব চলে এসেছে। মিসির আলি মনে মনে ঠিক করলেন, তাঁর কোনো দিন টাকা-পয়সা হলে এ রকম করে একটি ড্রইংরুম সাজাবেন। সে রকম টাকা-পয়সা অবশ্যি তাঁর হবে না। সবার সব জিনিস হয় না।

'আপনি কি আমার কাছে এসেছেন? আমি সাবির আকন্দ।

মিসির আলি ভদ্রলোককে দেখলেন। বেশ লম্বা। শ্যামলা গায়ের রঙ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মুখে একটি কঠিন ভাব আছে। তবে চোখ দু'টি বড় বড়, যা মুখের কঠিন ভাবের সঙ্গে মানাচ্ছে না।'

'আমি আপনাকে কোনো সময় দিতে পারব না। আমি আজ একটায় চলে যাচ্ছি।'

'আমি আপনার বেশি সময় নেব না। আপনি পত্রিকার এই কাটিংটি একটু দেখুন।'

আকন্দ সাহেব দেখলেন। কাটিংটি ফিরিয়ে দিয়ে মিসির আলির পাশে বসে ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'এটা আপনি আমাকে কেন দেখাচ্ছেন? কিছু কিছু জিনিস আমি মনে করতে চাই না। এটা হচ্ছে তার একটি।'

'মিসির আলি বললেন, 'আমার সঙ্গে একটি মেয়ে থাকে। আমার ধারণা, ও ইমা।'

ভদ্রলোক কোনো কথা বললেন না। তাঁর মুখের একটি পেশিও বদলাল না।

'আপনার এই মেয়ের কি খুব ছোটবেলায় ওপেন হার্ট সার্জারী হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। ইংল্যাণ্ডে। ওর বয়স তখন দু' বছর।'

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি আপনার পরিচয়টি জানতে পারি?'

'পারেন। আমার নাম মিসির আলি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন পার্ট টাইম শিক্ষক।'

আকন্দ সাহেব সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টানতে লাগলেন।

মিসির আলি বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি, ঘটনার আকস্মিকতা আপনাকে কনফিউজ করে ফেলেছে এবং এটা যে আপনারই মেয়ে, তা আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।'

ভদ্রলোক কিছু বললেন না।

মিসির আলি বললেন, 'একবার এই মেয়েটি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং জ্বরের ঘোরে বলতে থাকে--মামি ইট হার্টস, মামি ইট হার্টস--তখনই আমার প্রথম মনে হল---।'

মিসির আলি কথা বন্ধ করে আকন্দ সাহেবের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোকের মুখ রক্তশূন্য। মনে হচ্ছে এক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন। তারপর আনন্দ আর যন্ত্রণা একসঙ্গে মেশান গলায় আকন্দ সাহেব থেমে থেমে বললেন, 'খুব ছোটবেলায় হার্টের অসুখে কষ্ট পেত, তখন বলত· · 'মামি ইট হার্টস।' ওর নাভিতে একটি কালো জন্মদাগ আছে?'

'আমি বলতে পারছি না। তবে এই মেয়ে আপনারই মেয়ে কি না, তা বোঝার একমাত্র উপায় হচ্ছে DNA টেস্ট। আপনার এবং এই মেয়ের রক্ত পরীক্ষা করে সেটা বলে দেয়া সম্ভব। এটা একটা অভ্রান্ত পরীক্ষা।

'জানি। তার দরকার হবে না। আমি আমার মেয়েকে দেখলেই চিনতে পারব। আমি কি এখনই যেতে পারি আপনার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, পারেন।'

'আমি আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিতে চাই।'

'নিশ্চয়ই সঙ্গে নেবেন।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সমস্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তিনি বললেন, 'আপনি কী করেন?' এই প্রশ্ন আগে একবার করা হয়েছে এবং তার জবাবও দেয়া হয়েছে। তবু মিসির আলি দ্বিতীয়বার জবাব দিলেন।

আকন্দ সাহেব কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আমার মেয়েটি কী করে আপনার ওখানে?'

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, 'ও আছে কাজের মেয়ে হিসেবে। ভাত-টাত রেঁধে দেয়। বিনিময়ে খেতে পায় এবং থাকতে পায়।'

ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। যেন তিনি মিসির আলির কথা বুঝতে পারছেন না। তিনি ফিসফিস করে নিজের মনেই কয়েকবার বললেন, 'কাজের মেয়ে! কাজের মেয়ে!'

২১

বুধবার। সময় রাত আটটা একুশ।

মিসির আলি ভেবেছিলেন পিতা, কন্যা এবং মাতার মিলনদৃশ্যটি চিরদিন মনে

রাখার মতো একটি দৃশ্য হবে। কিন্তু বাস্তবে সে রকম হল না। কোনো হৈচৈ, কোনো কান্নাকাটি--কিছুই না। ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন হানিফার দিকে। এভাবে তাকিয়ে থাকার কিছু ছিল না। হানিফা দেখতে অবিকল তার মা'র মতো। নাকের ডগায় তার মা'র মতো একটি তিল পর্যন্ত আছে। ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা তোমার বাবা-মা, তুমি খুব ছোটবেলায় হারিয়ে গিয়েছিল। এখন আমরা তোমাকে নিতে এসেছি।'

হানিফা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল মিসির আলি দিকে। মিসির আলি হাসলেন। সাহস দিতে চেষ্টা করলেন। এ রকম একটি নাটকীয় মুহূর্তের জন্যে তিনি হানিফাকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাকে বলেছিলেন যে, তার বাবা-মা'র খোঁজ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং খোঁজ পাওয়া যাবে।

ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে হানিফার হাত ধরলেন। মিসির আলি ভেবেছিলেন, এই মহিলাটি হয়তো কিছুটা আবেগ দেখাবেন। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। হয়তো আবেগকে সংযত করলেন। ভদ্রমহিলার গলার স্বর ভারি মিষ্টি। তিনি মিষ্টি গলায় বললেন, 'মা, আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখ, আয়নায় তাকিয়ে দেখ--আমি অবিকল তোমার মতো দেখতে।'

মিসির আলি ওদের সামনে থেকে সরে গেলেন। বাইরের এক জনের উপস্থিতি হয়তো এদের কাছে ভালো লাগবে না।

তাঁরা চলে গেলেন পনের মিনিটের মধ্যে। যাবার আগে মিসির আলি বললেন, 'ওর জিনিসপত্রগুলি নিয়ে যান।' ভদ্রমহিলা কঠিন স্বরে বললেন, 'কোনোকিছুই নেবার প্রয়োজন নেই।'

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যাবার আগে এস. আকন্দ সাহেব অত্যন্ত শুকনো গলায় একবার শুধু বললেন, 'আমাকে কষ্ট করে খুঁজে বের করবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।' ব্যাস, এইটুকুই।

মিসির আলি ভেবে পেলেন না, এরা তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ কেন করলেন। তাঁদের মেয়েটি তার বাসায় গৃহভৃত্য ছিল, এইটিই কি তাঁদের মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে? এত বিচিত্র কেন মানুষের মন!

অবশ্যি তাঁদের বিচিত্র আচরণের অন্য একটি ব্যাখ্যাও দাঁড় করান যেতে পারে। হয়তো আজকের এই ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁরা হকচকিয়ে গেছেন। আচার-আচরণে অস্বাভাবিকতা এসে পড়েছে এ কারণেই।

মিসির আলি হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। হানিফা নামের মেয়েটির জন্যে খারাপ লাগছে। বেশ খারাপ লাগছে। মেয়ে জাতটাই হচ্ছে মায়াবতীর জাত। কখন যে এই মেয়েটি মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে, নিজেই বুঝতে পারেন নি।

হানিফার সঙ্গে তাঁর আর কোনোদিন দেখা হবে না। ওঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের মেয়েকে নিয়ে এখানে আসবেন না। তিনি নিজেও যাবেন না। কারণ তিনি কোনো পিছুটান রাখতে চান না কিংবা কে জানে, একদিন হয়তো যাবেন। দেখবেন ঝড়ের রাতে পাওয়া

ভিখিরি মেয়েটিকে রাজরাণী বেশে কেমন লাগছে। সে কি মনে রাখবে তার দুঃসহ শৈশব? যদি রাখে, তবেই সে জীবনে অনেক বড় হবে। এবং তার ধারণা, এই মেয়েটি তা মনে রাখবে।

মিসির আলি চোখ মুছে নিজের ঘরে ঢুকলেন। বারবার চোখ ভিজে উঠছে কেন? তাঁর মতো এক জন শুকনো ধরনের মানুষের হৃদয়ে এত ভালোবাসা কোথেকে এল?

দরজায় নক হচ্ছে। কে এল এত রাতে?

মিসির আলি দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখলেন--আকন্দ সাহেব। তাদের গাড়ি দূরে দাঁড়িয়ে। তিনি শুধু একা নেমে এসেছেন। মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার!'

'বাসার কাছাকাছি পৌছার পর মনে হল, আপনাকে আমি যথাযথ ধন্যবাদ দিই নি।'

'ধন্যবাদের কোনো প্রয়োজন নেই।'

'আপনার নেই। আপনি সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে। কিন্তু আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ।'

ভদ্রলোক জড়িয়ে ধরলেন মিসির আলিকে এবং ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী হানিফাকে নিয়ে নেমে এসেছেন গাড়ি থেকে। তিনি শক্ত করে হানিফার হাত ধরে রেখেছেন, যেন হাত ছেড়ে দিলেই মেয়েটি পালিয়ে যাবে।

মিসির আলি কোমল স্বরে বললেন, 'শান্ত হোন। আপনি শান্ত হোন। আসুন, ভেতরে গিয়ে বসি।'

ভদ্রলোক ধরা গলায় বললেন, প্লীজ, আরো কিছুক্ষণ আপনাকে জড়িয়ে রাখার সুযোগ দিন। প্লীজ।'

২২

বুধবার। সময় রাত দশটা চল্লিশ।

ওসমান সাহেবের ঘুমের সময় হয়ে গিয়েছে। ইঁদানীং তিনি সিডাকসিন না খেয়ে ঘুমাতে পারেন না। তিনি উঠলেন। একটি সিডাকসিন ট্যাবলেট খেয়ে মাথায় পানি ঢাললেন, হাত–মুখ ধুলেন। বিছানায় যাবার আগে রোজকার অভ্যেসমতো উঁকি দিলেন ফিরোজের ঘরে। গত তিন দিন তিন রাত ধরে ফিরোজ তার ঘরে আটক। দু' দিন দু' রাত সে ছটফট করেছে, জিনিসপত্র ভেঙেছে, খাবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ সারাদিন তেমন কিছু করে নি। ভাত–টাত কিছুই খায় নি, তবে কোনো রকম চিৎকার এবং হৈচৈ করে নি। এখন সম্ভবত করবে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পাগলামি বাড়ে, অস্থিরতা বাড়ে।

ওসমান সাহেব ফিরোজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ অবাক হলেন। ফিরোজ শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। গায়ে একটি শার্ট। চুল আঁচড়িয়েছে। মুখভর্তি খোঁচ খোঁচা দাড়ি নেই। শেভ করেছে। এবং সম্ভবত গোসলও করেছে। ওসমান সাহেব নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

'কেমন আছ ফিরোজ?'

'ফিরোজ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এবং সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ভালো আছি। তুমি কেমন আছ বাবা?'

'ভালো ভালো। আমি ভালো, বেশ ভালো।'

ওসমান সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কি অদ্ভুত কান্ড! ফিরোজ কি সুস্থ? নিশ্চয়ই সুস্থ।

'বাবা, মাকে ডাক। খিদে পেয়েছে, ভাত খাব।'

'নিশ্চয়ই খাবি। নিশ্চয়ই। কী দিয়ে খাবি?'

'যা আছে, তাই দিয়ে খাব। স্পেশাল কিছু লাগবে না।'

'লাগবে না কেন? নিশ্চয়ই লাগবে। দাঁড়া ডাকছি। তোর মাকে ডাকছি। তোর শরীরটা এখন ভালো, তাই না?'

'হ্যাঁ ভালো। বাবা, আমার ঘরটা খুব নোংরা হয়ে আছে, একটা ঝাড়ু দিতে বল। তালা খোলার দরকার নেই। জানালা দিয়েই দাও।'

ওসমান সাহেব ঝাড়ু এনে দিলেন এবং ছুটে গেলেন স্ত্রীকে খবর দিতে। ফরিদাকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে এনে দেখেন, ফিরোজ ঘর মোটমুটি পরিষ্কার করে ফেলেছে। কত সহজ এবং স্বাভাবিক তার ব্যবহার। ফরিদার চোখে পানি এসে গেল।

'মা, ভাত দাও আমাকে। খুব খিদে লেগেছে।'

'দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি। এক্ষুণি দিচ্ছি।'

'জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে দিও না মা। নিজেকে জন্তুর মতো লাগে। মনে হয় আমি চিড়িয়াখানার একটা পশু।'

'না না,জানালা দিয়ে খাবর দেব না। টেবিলে খাবার দিচ্ছি। তুই চেয়ার-টেবিলে বসে খাবি।'

'আর শোন মা, আমার বিছানার চাদর-টাদর বদলে দাও। ধবধবে সাদা চাদর দেবে।'

'দিচ্ছিরে বাবা, দিচ্ছি।'

আনন্দে ফরিদা বারবার মুখ মুছতে লাগলেন। সব ঠিক হয়ে গেছে। আর কোনো সমস্যা নেই তাদের দুঃস্বপ্নের রাত শেষ হয়েছে।

খাবার টেবিলে ভাত সাজিয়ে ওসমান সাহেব ফিরোজের ঘরের চাবি খুললেন। ফিরোজ বেরিয়ে এল। তার হাতে লোহার রড। তার পরনে একটি কালো প্যান্ট, খালি গা। সে থমথমে গলায় বলল, 'কি, ভয় লাগছে? ভয়ের কিছু নেই। মিসির আলির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ও আমার চিকিৎসা করবে।'

ওসমান সাহেব একটি কথাও বলতে পারলেন না। ফিরোজ হেঁটে হেঁটে গেল গেটের কাছে। দারোয়ানকে ঠাণ্ডা গলায় বলল গেট খুলে দিতে। দারোয়ান গেট খুলে দিল।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমতে শুরু করেছে। রাস্তায় কেন যে স্ট্রীট লাইট নেই। ফিরোজ লম্বা পা ফেলে অন্ধকারে নেমে গেল।

২৩

বুধবার।

জাহিদ সাহেব রাত এগারটার দিকে এক জন ডাক্তার ডেকে আনলেন।

নীলুর আকাশ–পাতাল জ্বর। তিনি নিজে হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। ডাক্তারের অবস্থাও তাই। ডাক্তার মুখ শুকনো করে বলল, 'এই মেয়েকে এক্ষুণি হাসপাতালে নিতে হবে। আমি আমার ডাক্তারী জীবনে এত জ্বর কারো দেখি নি। আপনি মেয়েটির মাথায় বরফ চাপা দেবার ব্যবস্থা করুন। আগে টেম্পরেচার কমাতে হবে।'

ফ্রীজে বরফ ছিল না। তারা দু' জন ধরাধরি করে নীলুকে বাথরুমে নিয়ে ঝরনার কল খুলে দিল। পানির ধারার স্রোতে যদি গায়ের তাপ কমান যায়।

নীলু পড়ে আছে মড়ার মতো। তার চোখ রক্তবর্ণ। সে কিছুক্ষণ পরপরই মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে এবং ফিসফিস করে বলছে, 'স্যারের বড় বিপদ। তুমি কি তাকে দেখবে না? এইটুকু কি তুমি আমার জন্য করবে না?'

জাহিদ সাহেব ডাক্তারকে বললেন, 'এই সব কী বলছে ডাক্তার সাহেব?'

'প্রলাপ বকছে। ডেলিরিয়াম। আপনি মেয়ের কাছে থাকুন, আমি এ্যাম্বুলেন্সের জন্যে যাচ্ছি। টেলিফোন আছে তো?'

'জ্বি আছে। বসার ঘরে।'

ডাক্তার সাহেব দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। নীলু কাতর স্বরে বলল, 'বাবা, তুমি খানিকক্ষণ আমাকে একা থাকতে দাও। আমি ওর সঙ্গে কথা বলি।'

'কার সঙ্গে কথা বলবি?'

'যে আমার সঙ্গে থাকে, তার সঙ্গে। ওর সাহায্য আমার ভীষণ দরকার। বাবা প্লীজ। প্লীজ। তুমি আছ বলে সে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। বাবা, আমি তোমার পায়ে পড়ি।'

নীলু সত্যি সত্যি হাত বাড়িয়ে বাবার পা স্পর্শ করল। জাহিদ সাহেব বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাঁপা ফুলের তীব্র সুবাস পেলেন।

স্পষ্ট শুনলেন নূপুর পায়ে কে যেন হাঁটছে। নীলুর কথাও শোনা যাচ্ছে, 'আমার এত বড় বিপদে তুমি আমাকে দেখবে না?'

অপরিচিত একটি কণ্ঠ শোনা গেল। জাহিদ সাহেব কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনি একমনে আয়াতুল কুরসি পড়তে লাগলেন।

২৪

বুধবার মধ্যরাত্রি।

মিসির আলির রুটিনের ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে। ঘরে রান্না হয় নি। তাঁকে রাতে হোটেলে খেয়ে আসতে হয়েছে। ডাল–গোশত নামের যে খাদ্যটি তিনি কিছুক্ষণ আগে গলাধঃকরণ করেছেন, তা এখন জানান দিচ্ছে। মিসির আলি পেটে ব্যথা নিয়ে জেগে আছেন। ফুড পয়জনিং–এর লক্ষণ কি না কে জানে? পেটের ব্যথা ভুলে থাকবার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে থ্রিলার জাতীয় কোনো রচনায় মনোনিবেশ করা। কিন্তু ঘরে এ জাতীয় কোনো বই নেই! তবু মিসির আলি বুক সেলফের কাছে গেলেন। সবই একাডেমিক বই। একটি সায়েন্স ফিকশন পাওয়া গেল––Horseman from the sky.' তেমন কোনো ইন্টাররেস্টিং বই নয়। আগে একবার পড়েছেন। তবুও সেই বই হাতে নিয়েই বিছানায় গেলেন এবং তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। বৃষ্টি ও বাতাস দুই–ই থেমে গেছে, তবুও। মাঝরাতে লোড শেডিং হবার কথা নয়, কিন্তু ঢাকা শহরের ইলেকট্রিসিটির কোনো ঠিক–ঠিকানা নেই।

মিসির আলি অত্যন্ত বিরক্ত মুখে ড্রয়ার খুললেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, ড্রয়ারে বড় বড় দু'টি মোমবাতি পাওয়া গেল। হানিফা নিশ্চয়ই একসময় কিনে রেখে দিয়েছে। মিসির আলি মোমবাতি জ্বালিয়ে বই খুললেন। দ্বিতীয়বার পড়বার সময় বইটি অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শারীরিক ব্যথা ভুলে আগ্রহ নিয়ে বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। চমৎকার লেখা––এক ভোরবেলায় মস্কো শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক ঘোড়সওয়ারের আগমন হল। লোকটির চেহারা কুৎসিত। মাথায় সার্কাসের ক্লাউনের টুপির মতো এক টুপি। সে তার ঘোড়া নিয়ে নানান খেলা দেখাতে শুরু করল। দেখতে দেখতে তাকে ঘিরে ভিড় জমে গেল।

এত মজার একটি বই আগের বার পড়তে এত বাজে লাগছিল কেন? পাঠকের জন্য? মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন––চা বানাবেন। চা খেতে খেতে আরাম করে পড়া যাবে। তাঁর মনে হল মোমবাতির আলোয় বই পড়ায় আলাদা একটা আনন্দ আছে। আধো আলো আধো ছায়া। বইয়ের জগৎটিও তো তাই––অন্ধকার এবং আলোর মিশ্রণ। লেখকের কল্পনা হচ্ছে আলো, পাঠকের বিভ্রান্তি হচ্ছে অন্ধকার। নিজের তৈরি উপমা নিজের কাছেই চমৎকার লাগল তাঁর। তিনি নিজেকে বাহবা দিয়ে সিগারেটের জন্যে পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিতেই দরজায় খুব হালকাভাবে কে যেন কড়া নাড়ল।

মিসির আলি ঘড়ি দেখলেন, রাত প্রায় একটা। এত রাতে কে আসবে তাঁর কাছে। তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, 'কে, কে?'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। মিসির আলি গলা উঁচিয়ে বললেন, 'কে ওখানে?'

'আমি।'

মিসির আলির বিস্ময়ের সীমা রইল না। নীলুর গলা। সে এত রাতে এখানে কী করছে? পাগল নাকি?

'কি ব্যাপার নীলু?'

নীলু জবাব দিল না। ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। মিসির আলি ছুটে গিয়ে দরজা খুললেন--নীলু নয়। ফিরোজ দাঁড়িয়ে আছে।

ফিরোজের দু'টি হাত পেছন দিকে। সে হাতে সে কী ধরে আছে তা মিসির আলির বুঝতে অসুবিধা হল না। তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন।

'কেমন আছ ফিরোজ? নীলুর গলা তো চমৎকার ইমিটেট করলে। এস, ভেতরে এস। ইস, ভিজে গেছ দেখি।'

ফিরোজ ভেতরে ঢুকল। পলকের জন্যে মিসির আলির ইচ্ছা করল ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু তিনি পারলেন না। তাঁর পা পাথরের মতো ভারি হয়ে গেছে। অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলার চেষ্ট করলেন।

'কিছু খাবে ফিরোজ? চা খাবে? ঠাণ্ডায় চা-টা ভালো লাগবে। ইন ফ্যাক্ট আমি চা বানানর জন্যেই উঠেছিলাম।

ফিরোজ দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে। সে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। সে মাঝে মাঝে ঠোঁট টিপে হাসছে।

মিসির আলি বললেন, 'বস ফিরোজ, দাঁড়িয়ে আছ কেন? এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। একটা সায়েন্স ফিকশন। তুমি কি সায়েন্স ফিকশন পড়?'

ফিরোজ এবার শব্দ করে হাসল। মিসির আলি শিউরে উঠলেন। কী অমানুষিক হাসি! এই হাসির জন্ম পৃথিবীতে নয়, অন্য কোনো ভুবনে। অচেনা ভয়ঙ্কর এক ভুবন, যার কোনো রহস্যই মিসির আলির জানা নেই। মিসির আলির সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল। তিনি বহু কষ্টে বললেন, 'তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে ফিরোজ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ফিরোজ? আমি কি তোমার ক্ষতি করেছি?

ফিরোজ তার জবাব দিল না। লোহার রডটি উঁচু করল। মিসির আলি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। চিৎকার দিতে ইচ্ছে করল, চিৎকার দিতে পারলেন না। তাঁর কাছে শুধু মনে হল, মোমবাতির আলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এবং আশ্চর্যের ব্যাপার--ছেলেবেলার একটি স্মৃতি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের এক দুপুরে তিনি ঝাপিয়ে পড়েছেন ব্রহ্মপুত্রের শীতল জলে। ঠাণ্ডা ও ভারি সেই পানি। মাছের চোখের মতো সেই স্বচ্ছ জলে ইচ্ছে করে তলিয়ে যেতে।

মৃত্যুর আগে গত জীবন চোখের সামনে একবার হলেও ভেসে ওঠে, এটা কি সত্য? হয়তো সত্য। নয়তো হঠাৎ করে ভুলে যাওয়া শৈশবের এই ছবি চোখে ভাসবে কেন?

মিসির আলি কিছু–একটা বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না। তার আগেই লোহার রড প্রচণ্ড বেগে নেমে এল তাঁর দিকে। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যথা। এক গভীর শূন্যতা। মিসির আলি বুঝতে পারছেন, তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর চারদিকে সীমাহীন জলরাশি। তিনি কিছু বলতে চেষ্টা করলেন––বলতে পারলেন না।

মিসির আলি। মিসির আলি। তাকাও তুমি। তাকিয়ে দেখ।

মিসির আলি চোখ মেললেন। মোমবাতি জ্বলছে। আলো এবং আঁধার। তিনি কি বেঁচে আছেন? নাকি এটা মৃত্যুর পরের কোনো জগৎ। কোনো অদেখা ভুবন?

'মিসির। মিসির।'

কে কথা বলে? কোত্থেকে আসছে কিন্নর.কণ্ঠ। ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু দেখার উপায় নেই। সমস্ত শরীর অসহ্য ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে এত কষ্ট! এত কষ্টও আছে পৃথিবীতে? কোথায়, ফিরোজ কোথায়?

মিসির। মিসির আলি। আর কোনো ভয় নেই। সে পালিয়ে গেছে। আমি এসেছি। তাকাও। তাকাও আমার দিকে।

কে পালিয়ে গেছে? কে কথা বলছে? কার দিকে তাকাতে বলছে? মিসির আলি তাকাতে গিয়ে ব্যথায় নীল হয়ে গেলেন। মুখ ভর্তি করে বমি করলেন। টকটকে লাল রক্ত এসেছে বমিতে। ফুসফুস ফুটো হয়েছে। পাঁজরের হাড় ঢুকে গেছে ফুসফুসে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এই কারণে।

মিসির আলির চোখে জল এসে গেল এত কষ্ট, এত কষ্ট।

'মিসির, মিসির।'

'কে তুমি?'

'তাকিয়ে দেখ।'

মিসির আলি তাকালেন। যন্ত্রণা এবং ব্যথার জন্যেই কি তিনি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছেন? হেলুসিনেশন? হেলুসিনেশন।

'মিসির আলি, আমি কে বল তো।'

'জানি না কে।'

'ভালো করে দেখ, ভালো করে দেখ। চোখ নামিয়ে নিচ্ছ কেন? আমার সঙ্গে কথা বলতে থাক, তাতে ব্যথা ভুলে থাকবে। বল আমি কে?'

মিসির আলি আবার মুখ ভর্তি করে বমি করলেন।

'আমিই সেই দেবী। তুমি তো আমাকে বিশ্বাস কর না। নাকি এখন করছ?'

'তুমি আমার কল্পনা। উইশফুল থিংকিং। দেবী আবার কি?'

'আমিই কিন্তু তোমাকে বাঁচিয়েছি।'

দেবীমূর্তি খিলখিল করে হেসে উঠল। কী চমৎকার হাসি! কী অপূর্ব সুরধ্বনি! ঘরে চাঁপা ফুলের গন্ধ, তীব্র সৌরভ। হেলুসিনেশন। হেলুসিনেশন হচ্ছে। হেলুসিনেশন ছাড়া এ

আর কিছুই নয়।

দেবী হাসল। চাঁপা ফুলের গন্ধ কী দেবীর গা থেকেই আসছে? তাকে রক্তমাংসের মানবীর মতোই লাগছে। ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কী কষ্ট। কী কষ্ট! মিসির আলি হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'দেবী, আমার কষ্ট কমিয়ে দাও।'

'আমাকে বিশ্বাস করছ তাহলে?'

'না।'

'কেন করছ না? এ জগতের সমস্তই কি যুক্তিগ্রাহ্য? এই আকাশ, অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ? তুমি কি বলতে চাও, এর কোথাও কোনো রহস্য নেই? অসীম কী? এই সামান্য প্রশ্নের জবাব কি তোমার জানা আছে? বল, তুমি জান?'

'আজ জানি না, কিন্তু একদিন জানব। আমি না জানলেও আমার পরবর্তী বংশধর জানবে।'

'মিসির আলি, তুমি বড় অদ্ভুত লোক।'

মিসির আলি কাতর কণ্ঠে বললেন, 'আমার ব্যথা কমিয়ে দাও। আমার ব্যথা কমিয়ে দাও।'

দেবী হেসে উঠল। মৃদু স্বরে বলল, 'আমায় বিশ্বাস করছ না, অথচ ব্যথা কমিয়ে দিতে বলছ?'

'বড় কষ্ট, বড় কষ্ট।'

'তোমার বন্ধু চলে আসছে। তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। তুমি আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। এবং মজার ব্যাপার কি জান? নীলুর সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার। যদি কোনোদিন হয়, আমার কথা মনে করো।'

মিসির আলি আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন। তিনি দেবীর কথা এখনো শুনতে পাচ্ছেন। কী অপূর্ব কণ্ঠ! কী অলৌকিক সৌন্দর্য! কিন্তু এ সবই মায়া। অসুস্থ ব্যথা-জর্জরিত মনের সুখ-কল্পনা। প্রকৃতি চাচ্ছে নারকীয় কষ্ট থেকে তাঁর মন ফিরিয়ে নিতে। সে জন্যেই সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে তাঁকে ভোলাচ্ছে। হয়তো নীলুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। প্রমাণ বড় কঠিন জিনিস। বড় কঠিন।
মিসির আলি কাতর কণ্ঠে বললেন, 'কষ্ট কমিয়ে দাও। কষ্ট কমিয়ে দাও।'

অপরূপা নারীমূর্তি চাঁপা ফুলের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে দূরে সরে যাচ্ছে। তার পায়ে ঝুমঝুম করছে নূপুর। কে যেন দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। কে সে? সাজ্জাদ হোসেন? ওরা কি ধরে ফেলেছে ফিরোজকে? ওকে সুস্থ করে তুলতে হবে। ইসিটি দিয়ে দেখলে হয়। কিংবা কে জানে হয়তো এখন সে সুস্থ। তাঁকে একবার আঘাত করেই তার চেতনা ফিরে এসেছে।

হানিফা। হানিফা কেমন আছে? কোথায় আছে? সুখে আছে তো?

আহ্ বড় কষ্ট। কেউ আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। ঘুম পাড়িয়ে দাও। আমি তলিয়ে যেতে চাই অতল অন্ধকারে। বড় কষ্ট, বড় কষ্ট।

সাজ্জাদ হোসেন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। টর্চের আলো ফেললেন মিসির আলির মুখে। সাজ্জাদ হোসেনের মুখে এক ধরনের প্রশান্তি লক্ষ করা গেল। কারণ, নগ্নগাত্র আগন্তককে কিছুক্ষণ আগেই ধরা হয়েছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, পুলিশকে সে প্রথম যে কথাগুলি বলে তা হচ্ছে, 'আপনারা স্যারকে বাঁচানর চেষ্টা করুন। এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যান। আর আমার বাবাকে টেলিফোন করে বলুন, আমি ভালো হয়ে গেছি। স্যারের বাসায় এক জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে ভালো করে দিয়েছে।'

গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই কাল্পনিক। পরিচিত কিছু চরিত্র এবং কিছু ঘটনা ব্যবহার করেছি। তবে কাউকে হেয় করবার জন্যে করা হয় নি। মানুষের প্রতি আমার মমতা মিসির আলির মতো হয়তো নয়, কিন্তু খুব কমও নয়।

For More Books Visit www.MurchOna.com
Murchona Forum: http://www.murchona.com/forum/index.php

Created with an unregistered version of SCP PDF Builder

You can order SCP PDF Builder for only $19.95USD from http://www.scp-solutions.com/order.html